তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৫৯-৬০-এর নীল বিদ্রোহ এবং দুই বিদ্রোহে বাঙালির মনোভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে যুক্তি আর তথ্যের সাহায্যে। এ অংশে বাংলা নাটক, কাব্য ও কথাসাহিত্যে নবযুগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে; আলোচিত হয়েছেন মূলত মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালির রাষ্ট্রনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স কমানোর বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন—এই দুটি দিকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সংগ্রামের আলোচনা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে। তবে এ অংশের মূল বিষয় কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান আন্দোলন এবং ব্রাহ্ম সমাজের বিভাগ।

ওদুদ বেশ বিস্তৃতভাবে উদাহরণ ও উদ্ধৃতি দিয়ে কেশবচন্দ্রের আন্দোলনের গুণ ও দোষসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বিবৃতি আর বিশ্লেষণ, তথ্য এবং যুক্তির সুমিত সমন্বয়ে অধ্যায়টি বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্রমাবনতি এবং নব জাগরণ সময়ে তাদের আত্মসংশোধন প্রয়াস বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সীমা উনিশ শতকের শেষে কংগ্রেস স্থাপনের সময় পর্যন্ত প্রসারিত। এ অংশে বক্তব্যের স্বচ্ছতার প্রয়োজনে কালানুক্রমিকতার বিন্যাস হয়েছে স্বতন্ত্র। অন্যান্য অধ্যায়ের মতো পূর্ববর্তী-পরবর্তী অধ্যায়গত যোগ এ অংশে অনুপস্থিত। অধ্যায়ের প্রথমাংশে ইংরেজ শাসনের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থার অবনমন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নিষ্কর ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় মুসলিম উচ্চবিত্তদের দুর্গতি, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিদ্বেষবশত ইংরেজি শিক্ষাবিষয়ে বিরোধী মনোভাব—এইসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের প্রথম পরিবর্তনমূলক আন্দোলন শুরু হয় আরবে—সেই ওহাবি আন্দোলনের মূল কথা ছিল আদি ইসলামে ফিরে গেলেই মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হবে। ভারতেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত ওদুদ তিতুমিরের কথাও যথাসম্ভব যানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সিপাহি বিদ্রোহ, ওহাবি বিদ্রোহ, মুসলিম-শিখ যুদ্ধের ইংরেজ-মুসলিম যুদ্ধে পরিণতি—এ সবের ফলে মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজ-শাসকদের সম্পর্কের তিক্ততার বৃদ্ধি—কোনো কিছুই ওদুদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য যে সব শিক্ষিত মুসলমান সক্রিয় হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ ও তাঁর স্থাপিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, সৈয়দ আমির হোসেন, আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ। কিন্তু এঁদের প্রচেষ্টার ত্রুটি হল ইংরেজি ভাষা, শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি করাকেই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা। এই আধুনিক শিক্ষাকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর জন্য জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বিষয়ে তাঁদের প্রয়াস তেমন শক্তিশালী ছিল না। এইভাবে বিবরণ-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাংলার তথা ভারতের অবস্থা- পরিবর্তনের একটি পূর্ণ ভাষাচিত্র এই ছোটো অধ্যায়টিতে কাজী আবদুল ওদুদ অঙ্কিত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ, শশধর তর্কচূড়ামণির অদ্ভুত মতবাদ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নির্মোহ দৃষ্টিতে যুক্তিসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন। এ অংশেও আছে প্রাসঙ্গিক বিস্তৃত উদ্ধৃতি।

অধ্যায়টিকে ওদুদ তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম ভাগে আছে বাংলার স্বদেশপ্রীতি কেমন করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক জাগরণে পরিণত হল তারই বিবৃতি এবং বিশ্লেষণ। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াসে হয়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় এক প্রতিষ্ঠান। যদিও উত্তর ভারতে স্বজাতিপ্রেমিক স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজদের সঙ্গে প্রীতিসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাধা দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত হলেন না। ফলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হয়ে উঠল সর্বভারতীয় এক প্রতিষ্ঠান।

পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ওদুদ দেখিয়েছেন কেমন করে শাসক ইংরেজের বিরূপতা, বাঙালির শক্তির স্ফুরণকে দমিত করার জন্য সক্রিয়তা আর কর্নেল ওলকট ও মাদাম হেলেনা পেট্রভনা ব্লাভাট্স্কি-র থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রয়াস—বাংলার রেনেসাঁসজাত সৃষ্টিধর্মী উদার মানসিকতার প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করল।

ইলবার্ট বিল-এ বিচার বিভাগে কয়েক শ্রেণির ভারতীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে ইউরোপীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট-এর সমমর্যাদা দানের প্রস্তাব করা হয়। এদেশের ইউরোপীয়গণ সমবেতভাবে এর বিরোধিতা করে এই যুক্তিতে যে ইউরোপীয় অপেক্ষা এদেশের প্রতিমাপূজক জাতিভেদ-বিশ্বাসী অধিবাসীগণ নৈতিক হীনতার জন্য উন্নত ইউরোপীয়দের বিচারক হওয়ার অযোগ্য। এই অপমানের ফলে সমাজের সংস্কারসমূহের সমর্থনের মনোভাব আর ইউরোপীয় সমাজের সমালোচনার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল দেশবাসীর মনে।

তারই সঙ্গে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে শশধর তর্কচূড়ামণির প্রয়াসে সনাতনপন্থীদের বল বৃদ্ধি পেল। বিশেষত তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করায় সহজে তাঁর মত জনচিত্ত আকর্ষণ করেছিল। এইভাবে ক্রমশ সনাতনপন্থীরা হয়ে উঠেছিল বেশ শক্তিশালী। থিয়সফি আন্দোলনে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর জোর দেওয়ায় সংস্কারবিরোধী দল প্রবল হয়ে উঠল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ এইভাবে পরিণত হল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে। এই পুনরুজ্জীবনবাদকে সহায়তা করল রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে ওদুদ দেখিয়েছেন রামকৃষ্ণ আসলে ছিলেন পুরোনো আত্মসম্পূর্ণ অধ্যাত্মবাদের সাধক। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুগপ্রভাব তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর সকল মত যে সমর্থনযোগ্য নয়—ওদুদের নিপুণ বিশ্লেষণ সে সত্য প্রমাণ করেছে। যেমন রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'—বাণীটি যে যথার্থ নয় তা তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কারণ কোনো ধর্মই সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রতি ধর্মের মধ্যে আছে মিথ্যা বা অসার্থক চিন্তা। মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তাই প্রকৃত ধর্ম। আনুষ্ঠানিক ধর্ম যদি মনুষ্যত্ব সাধনের সহায়ক না হয় তবে তা আচার মাত্র।

পরমহংসদেবের অপূর্ব ভগবৎনির্ভরতা, সন্ন্যাস প্রীতি, ভাবসমাধি, তাঁকে অবতার বলে শিষ্যগণের প্রচার আর বিবেকানন্দের বিশ্বজয় এই সবের সমন্বয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুক্তিধর্মী সৃষ্টিশীল মানসিকতার প্রসার। স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে ছিলেন প্রাণবন্ত তরুণ। কিন্তু যুগধর্ম তাঁকে করে তুলল সংশয়ী ও জিজ্ঞাসু। তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অসম্ভব দৈহিক ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়ে গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণকেন্দ্রিক সমাজসেবার একটি বিশাল সংস্থা—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

ওদুদ সুন্দরভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ত্রুটি ও দুর্বলতার এবং শক্তির দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন বিবেকানন্দের ত্রুটি ছিল সার্থক মূল্যবান চিন্তাধারার সঙ্গে দুর্বল অস্পষ্ট ভাবনার মিশ্রণ। যেমন ধর্মকে তিনি সমাজ-সংস্পর্শ-বিহীন আত্মচিন্তারও উৎকর্ষ প্রাপ্তির পথ হিসেবে দেখেছেন। অথচ বাস্তবে তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করেছেন, মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) ব্রাহ্মণদের জাতিগর্বে আঘাত দিয়েছেন। নারীদের সমস্যা সমাধানের কোনো প্রয়াসও তিনি করতে পারেননি। তবে ওদুদ স্বীকার করেছেন প্রবল পৌরুষ এবং গভীর মানবপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেমেই বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয়। তাঁর এই প্রীতির বলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও রামকৃষ্ণের ভগবৎ-সাধনা শক্তিলাভ করেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসপ্রীতি, প্রবল ঈশ্বরনির্ভরতার মতো জীবনবিমুখ প্রবণতার ফলে তা দেশ ও জাতির জীবনে ইতিবাচক কোনো শক্তি সঞ্চারে সমর্থ হয়নি।

এইভাবে রেনেসাঁস-এর প্রতি স্তরের নেতাদের কর্মপ্রণালীর পূর্ণ বিশ্লেষণ ওদুদের এই দীর্ঘ প্রবন্ধকে দিয়েছে সম্পূর্ণতা। দীর্ঘতা সত্ত্বেও শিথিলতা নেই তাঁর রচনায়—এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তথা শেষ অধ্যায়ে বিবরণ আর বিশ্লেষণ রীতির সমন্বয়ে বাংলার রেনেসাঁস-এর বিপর্যস্ত হওয়ার দিকটি স্পষ্টতা পেয়েছে। এখানে তিনি তথ্য, উদাহরণ আর যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন হিন্দু জাতীয়তাবাদ আসলে ছিল হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি গৌরববোধ। যদিও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাকে দীপ্তি দিয়েছিল তবু তা ছিল কিছুটা সংকীর্ণ। এরপর আছে শ্রী অরবিন্দের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বিশ্লেষণ-ভিত্তিক আলোচনা। সিস্টার নিবেদিতার মূল্যায়নও এ অংশে স্থান পেয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন ভারতীয়দের ইংরেজ ও ইউরোপ সম্বন্ধে ভয়হীন করা এবং নিজস্ব আত্মিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ছিল এই দুই ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য।

অধ্যায়টির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চেতনার বিশ্লেষণ ও বিচার। ওদুদ যথার্থই দেখিয়েছেন যে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অল্প দিনেই; আর গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয়দের আত্মশক্তিতে উদ্‌বোধিত করবার পথ। ১৯০৫-এর বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনা এবং তা রোধ করার জন্য বাঙালির প্রাণপণ প্রয়াসই তাঁকে প্রাণিত করেছিল এই কর্মে। কারণ বঙ্গ ভঙ্গ কালের বিরোধী আন্দোলন বয়কট-এর মাধ্যমে দৈহিক শক্তিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে জাগে বিরূপতা। শাসক-সহায়তায় সে বিরূপতা দ্রুত হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক। দেখা দেয় দাঙ্গা। ভারতীয় কংগ্রেস ক্রমে হয়ে উঠেছিল শক্তিমান—সেখানেও দেখা দেয় চরমপন্থী দল। নরম দলের সঙ্গে চলে তাদের বিরোধ। বাড়তে থাকে শাসকদলের নিপীড়ন। সেই সময়ে ঘটে ১৯০৮-এর ২৫মে মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা—যাতে ভারতবিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন বিচারক কিংসফোর্ড-এর বদলে মারা যায় দুই ইংরেজ মহিলা। এ ঘটনার এক মাসের মধ্যে মানিকতলায় আবিষ্কৃত হয় বোমার কারখানা।

এর ফলে নেতাদের মধ্যে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। নব শক্তিতে উদ্‌বোধিত তরুণদলের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ এ পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্যা-জটিলতা এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। তাঁর সেই পথনির্দেশের প্রকৃতি ও সত্যতা—প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র-প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এবং বিশ্লেষণ দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ওদুদ। কিন্তু এই সত্য পথ কবির স্বপ্ন বলে উপেক্ষিত হয়।

প্রবন্ধের শেষের দিকে আছে জাতীয় কংগ্রেসের নতুন নেতা মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের বিশ্লেষণ। কাজী আবদুল ওদুদ তথ্য ও যুক্তির দ্বারা বিশদ করেছেন কেমন করে গান্ধি হয়ে উঠলেন নব জাগরণ-উদ্ভূত মানবতার দূত।

দীর্ঘদিন গান্ধিজি চিরাগত ধর্মীয় ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন শুরু করার পর তিনি উপলব্ধি করলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন লিখিত ধর্মশাস্ত্র ধর্ম নয়—ধর্ম মানে চিরন্তন মানব বিবেক, Religion is eternal human conscience. এভাবেই ওদুদ গান্ধিজিকে বাংলার রেনেসাঁস-নায়কদের পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

এর পরে ওদুদ ব্যাখ্যা করেছেন রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধিজির অহিংস অসহযোগ সর্বাংশে গৃহীত ও সফল না হওয়ার কারণ। এই রূপে তিনি বাংলার নব জাগরণের প্রধান ধারা জাতীয় উন্নতির ধারা, জীবনবোধ ও রাজনীতির ধারা কেমন করে সন্ত্রাসবাদের উত্তেজনায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়—সে ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

বাংলা রেনেসাঁস-এর অন্যান্য ধারা—সাহিত্য, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায়—সব কয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার মুসলমানদের একাংশের মধ্যে উদার মানবতার প্রকাশ ঘটেছিল সে সত্য বিবৃত ও বিশ্লেষণ করায় ওদুদের আলোচনা হয়ে উঠেছে সামগ্রিকতায় সুন্দর।

সমাপ্তিতে তিনি বাংলার নব জাগরণ বিপর্যস্ত হওয়ার কারণ রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির দ্বারা স্পষ্ট করে

দিয়েছেন। অনেকে বলতে পারেন এর ফলে লেখকের স্বকীয় চিন্তাশক্তির অভাব বড়ো হয়ে উঠেছে। এই মত গ্রহণ করা যায় না এ কারণে যে রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির নির্বাচনটি হয়েছে সংগত। এবং এক্ষেত্রে কবির বিশ্লেষণ যথার্থ ও সর্বোত্তম।

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন মননশীল গদ্য সাহিত্যিক। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা চিন্তার ভারে ক্লিষ্ট নয়—মননদীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং প্রাঞ্জল। ক্বচিৎ ঈষৎ আবেগের প্রকাশ লক্ষিত হলেও তিনি চিন্তাবিদের কাম্য নিরাসক্তি প্রায় সর্বত্র বজায় রাখতে পেরেছেন। স্বচ্ছ, স্পষ্ট, বলিষ্ঠ গদ্যভাষা এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে কখনও ক্লান্তিকর করে তোলেনি।

তাই আমরা বলতে পারি বিবৃতি ও বিশ্লেষণের সুষম অন্বয়, তথ্য ও যুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার, পক্ষপাতহীনতা, রেনেসাঁস-এর প্রতিটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা এবং ভাষার স্বচ্ছতা 'বাংলার রেনেশাঁস'কে প্রকৃত সাহিত্যগুণান্বিত অথচ বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ করে তুলেছে। বাংলার রেনেসাঁসকে তিনি যেভাবে পাঠকের সামনে পূর্ণায়তরূপে উপস্থাপিত করেছেন সেটি তাঁর প্রবন্ধশিল্পী হিসেবে সফলতার প্রমাণ।

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কাজী আবদুল ওদুদের দৃষ্টিতে বাংলার রেনেসাঁস-এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

২। মুসলমান সমাজ এবং বাংলার রেনেসাঁস—কাজী আবদুল ওদুদের অনুসরণে উভয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৩। কাজী আবদুল ওদুদের মতে কোন কোন কারণে কোন সময়ে বাংলার রেনেসাঁস বিপর্যস্ত হয়েছিল—বিশ্লেষণ করুন।

৪। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন—মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ওহাবি আন্দোলন।

২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। কাজী আবদুল ওদুদ—আবদুল কাদির (ঢাকা)

২। কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (২য় খণ্ড) সম্পাদনা—আবদুল হক (ঢাকা)

৩। কাজী আবদুল ওদুদ : স্মৃতি ও সত্তা—সম্পাদনা অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, জাহিরুল হাসান, আশিস দে, শীতলদাস জোয়ারদার

৪। শুভোদয়—অন্নদাশঙ্কর রায়

৫। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। আবদুল ওদুদ নির্বাচিত প্রবন্ধ;

একক ৩ □ উত্তরতিরিশ : বুদ্ধদেব বসু

গঠন

৩.০ বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত জীবনী

৩.১ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

৩.২ 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থ পরিচয় ও প্রবন্ধ পরিচয়

৩.৩ গঠন শিল্প : 'উত্তরতিরিশ'

৩.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর মাতামহের কর্মস্থল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লায় বুদ্ধদেব বসুর জন্ম। ভূদেবচন্দ্র বসু ও বিনয়কুমারীর পুত্র বুদ্ধদেব জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃহারা হন। পিতা পরে দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বুদ্ধদেবের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাঁকে পালন করেন মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ও মাতামহী স্বর্ণলতা। নোয়াখালিতে তাঁদের বাড়িতেই কেটেছিল বুদ্ধেদেবের বাল্যজীবন।

শিক্ষা : চিন্তাহরণ সিংহ ছিলেন সেকালের দারোগা কিন্তু গভীর ছিল তাঁর বিদ্যানুরাগ। বুদ্ধদেবকে তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত ও গণিত শিক্ষা দান করেন। এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও উৎসাহিত করেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লেখকদের বই পড়েই তিনি বাংলা শিখেছিলেন। ১৯২২-এ নোয়াখালি ছেড়ে ঢাকায় আসেন বুদ্ধদেব। ১৯২৩-এ তিনি ভরতি হয়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নবম শ্রেণিতে।

বুদ্ধদেব ছিলেন মেধাবী ছাত্র। মাতামহের দেওয়া উপযুক্ত পাঠ পুষ্ট করেছিল সেই মেধাকে। তাই ১৯২৫-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি প্রথম বিভাগে পঞ্চম হয়ে পাস করেন এবং ঢাকার সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের আই. এ. ক্লাসে ভরতি হন। এই কলেজের গ্রন্থাগারে ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থ। 'লন্ডন মার্কারি' আমেরিকার 'ডায়াল' প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত আসত গ্রন্থাগারে। প্রচুর পাশ্চাত্য সাপ্তাহিক পত্রিকাও নেওয়া হত। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক মন গড়ে ওঠার কাজে সহায়তা করেছিল এই গ্রন্থাগার।

প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে ১৯২৭-এ আই. এ. পাস করে বুদ্ধদেব লাভ করেন কুড়ি টাকার মাসিক বৃত্তি। এ বছরের জুলাই-এ তিনি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসে ভরতি হন। ১৯৩০-এ তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বি.এ. পাস করেন। পরের বছর ১৯৩১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করেন; এ পরীক্ষায়ও তিনি ছিলেন প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানের অধিকারী।

কর্মজীবন : ১৯৩১-এ ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় আসেন বুদ্ধদেব। বছর দুয়েক গৃহশিক্ষকতা আর ছোটো গল্প-উপন্যাস রচনাই ছিল তাঁর আয়ের উৎস। ১৯৩৪-এ তিনি রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৫-এ তিনি এ কাজ ছেড়ে দেন। ১৯৪৪-এ তিনি দৈনিক 'দি স্টেটসম্যান'

('The Statesman') পত্রিকায় স্বাধীন সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৪৫-এ তিনি এ পত্রিকার তৃতীয় সম্পাদকীয় লেখার কাজ পান। কিন্তু সাহিত্যচর্চা বিঘ্নিত হচ্ছিল বলে তিনি ১৯৫১ সালে দুটি কাজই ছেড়ে দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সৌজন্যে ১৯৫২ সালে তিনি ছ-মাসের জন্য ইউনেস্কোর এক প্রকল্পের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

১৯৫৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ-এর পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেন-এ এক বছরের জন্য অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬-তে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পদত্যাগ করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু-বছরের এক বক্তৃতা-সফরে আমন্ত্রিত হন। ১৯৭০-এ তিনি 'পদ্মভূষণ' লাভ করেন। তাঁর অবশিষ্ট কর্মজীবন ছিল সাহিত্যনির্ভর। মূলত কবি বুদ্ধদেব জীবিকার চাপে লিখেছিলেন ছোটোগল্প, উপন্যাস, আর ছোটোদের গল্প-উপন্যাস। ফলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে একথা বলা যায়। ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাহিত্যজীবন : জ্ঞানোন্মেষের পর থেকেই সাহিত্যমনস্ক বুদ্ধদেবকে শব্দ দিয়ে গঠিত ছবি মুগ্ধ করত; প্রকৃতির সাহচর্যেও তৃপ্ত হত তাঁর মন। এভাবেই তাঁর সাহিত্যিক মন পরিণত হয়ে উঠেছিল। নয় বছর বয়সে তিনি ছয় থেকে সাত স্তবকের একটি ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। এটিই তাঁর প্রথম রচনা। এরপরে অবশ্য তাঁর রচনার মাধ্যম হয় বাংলা। পয়ার-ত্রিপদীতে তিনি রচনা করেন রামায়ণ, কিশোর পত্রিকা 'মৌচাক'-এ পাঠাতে থাকেন লেখা; প্রকাশ করেন হাতে লেখা পত্রিকা 'বিকাশ' বা 'পতাকা'। ঢাকার 'তোষিণী' ভিন্ন কলকাতার 'অর্চনা', 'নারায়ণ', 'শঙ্খ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় তাঁর কবিতা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর একটি ইংরেজিতে লেখা গল্প।

তেরো থেকে পনেরো বছর বয়সে বুদ্ধদেব যেসব কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি থেকে নির্বাচিত তিরিশটি কবিতার সংকলন 'মর্ম্মবাণী' ১৯২৪-এ ঢাকা থেকে বের হয়। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ঢাকার 'প্রাচী' পত্রিকায় বের হয় বুদ্ধদেব বসুর প্রথম বাংলা গল্প 'একটা বসন্তের দিন'।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোল'-এ মুদ্রিত হয় বুদ্ধদেব বসুর বিতর্কিত অশ্লীলতার অপবাদগ্রস্ত গল্প 'রজনী হ'লো উতলা'। লেখকের বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর।

১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে বুদ্ধদেব রচনা করেন একটি অভিনন্দন 'কবিতা'। কবিতাটি কবি-সংবর্ধনা সভায় পঠিত হয়।

আই. এ. পরীক্ষার পর ঢাকায় লেখা হয় বুদ্ধদেবের নিজস্বতায় উজ্জ্বল প্রথম কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'। কবিতাটি মুদ্রিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল'-এ। বুদ্ধদেব বসু তখন বের করতেন হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রগতি'। আই. এ. পরীক্ষায় পাওয়া বৃত্তির অর্থে ১৯২৭-এ পত্রিকাটি মুদ্রিত রূপ পায়। মাত্র দু বছর চললেও (১৯২৯-এ বন্ধ হয়ে যায়) পত্রিকাটি বাংলার সাহিত্য জগতে তুলেছিল আলোড়ন। এ পত্রিকার অন্য সম্পাদক ছিলেন কবি অজিতকুমার দত্ত।

'কল্লোল'-এর মতো 'প্রগতি'ও ছিল সমকালীন জীবন বিশেষত নীচের তলার মানুষের জীবনের রূপকার। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বকীয়তায় বিশিষ্ট হবার প্রয়াস করেছিল এ পত্রিকা। তার অন্বিষ্ট ছিল 'সহস্রের নিষ্পেষণের নাগপাশ থেকে' ব্যক্তির মুক্তি-প্রচেষ্টা (সম্পাদকীয়, প্রথম সংখ্যা)। 'প্রগতি' কবি জীবনানন্দ দাশকে এনেছিল প্রকাশের জগতে। তাঁর অন্যান্য কবিতার সঙ্গে বিখ্যাত 'বোধ' আর 'অবসরের গান' মুদ্রিত হয় 'প্রগতি'তেই। 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ্য 'প্রগতি'তে মুদ্রিত হয়েছিল বিষ্ণু দে-র কবিতা, বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের অনেক কবিতা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', বুদ্ধদেবের 'টান', 'ঝুট' ইত্যাদি গল্পের সঙ্গে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'ও 'প্রগতি'-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর 'অতি আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য' (মাঘ ১৩৩৪), 'বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ' (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৬) প্রভৃতি প্রবন্ধও 'প্রগতি'-তে মুদ্রিত হয়। এ সময়েই ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'কল্লোল'-এ মুদ্রিত হয় তাঁর প্রবন্ধ 'কবি সুকুমার রায়'। প্রবন্ধটি সুকুমার রায়কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বলা যায় পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বই বুদ্ধদেব বসুকে করেছিল প্রাবন্ধিক; যেমন জীবিকার দায় কবি বুদ্ধদেবকে করে তুলেছিল কথাসাহিত্যিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ছাত্র সংসদের সাহিত্য-সম্পাদক। তাঁর প্রয়াসে উন্নত হয়েছিল জগন্নাথ হলের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'। বুদ্ধদেবের 'বঙ্কাবতী' নামের প্রসিদ্ধ কবিতা এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালে মুদ্রিত হয় বুদ্ধদেব বসু-র প্রথম কবিতা-সংকলন 'বন্দীর বন্দনা', প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' এবং প্রথম গল্প-সংকলন 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প'।

১৯৩১-এ বুদ্ধদেব চলে আসেন কলকাতা। এখানে তাঁর জীবন ছিল লেখনীনির্ভর। জীবনধারণের দায়ে তিনি লিখেছিলেন অজস্র গল্প আর বেশ কিছু উপন্যাস। 'আমার যৌবন' বুদ্ধদেব স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন "আমি লিখছি শুধু নগদ মূল্যে উপন্যাস আর ছোটো গল্প আর ছোটোদের গল্প আর ফাঁকে ফাঁকে বিনোদ হিসেবে খেয়ালি চালে মজুরিহীন প্রবন্ধ দু-একটা।" ('আমার যৌবন', বুদ্ধদেব বসু ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৮২)

বুদ্ধদেব বসুর 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' গল্প-সংকলনটি ১৯৩২ সালে অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬৭ তে প্রকাশিত তাঁর 'রাত ভরে বৃষ্টি' ও অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিচারে তাঁর জয় হয়।) তখন বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে গঠিত হয় নতুন প্রকাশন সংস্থা, গ্রন্থকারমণ্ডলী। স্বল্পায়ু এই সংস্থা থেকে বের হয়েছিল মোট তিনটি কবিতা-সংকলন; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আমরা', বুদ্ধদেব বসুর 'একটি কথা' এবং বিষ্ণু দে-র প্রথম কবিতা-সংকলন 'উর্বশী ও আর্টেমিস'।

১৯৩৫-এর ১ অক্টোবর বুদ্ধদেব বসু আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় বের হয় প্রথম কবিতা বিষয়ক বাংলা পত্রিকা ত্রৈমাসিক 'কবিতা'। সহকারী সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। পত্রিকাটি চলেছিল প্রায় পঁচিশ বছর—শেষ সংখ্যা বের হয় ১৯৬১ সালে। তৃতীয় বর্ষ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন, ১৯৪০ সালে সরে যান সমর সেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর একক সম্পাদনায় বের হতে থাকে 'কবিতা'। এক সময়ে সহকারী সম্পাদক হিসেবে এসেছিলেন নরেশ গুহ (১৯৫৪-১৯৫৮) ও জ্যোতির্ময় দত্ত (পৌষ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যাটির)। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকা পুরোপুরি ছিল বুদ্ধদেব-নির্ভর। কবিতাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, আধুনিক কবিতার প্রচার, বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ, আধুনিক কবিতার যথার্থ সমালোচনা—এই ছিল পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। বহু নতুন কবির কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় 'কবিতা'-য়। বিশেষ উল্লেখ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায়।

বুদ্ধদেব 'বৈশাখী' নামের একটি বার্ষিকীর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে, চলেছিল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। হুমায়ুন কবিরের সম্পাদনায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ'। প্রথম বছরে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন এ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক।

'কবিতা' প্রকাশের কিছু পরে বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে গড়ে ওঠে প্রকাশন-সংস্থা 'কবিতা ভবন'। ১৯৪২ সাল থেকে 'কবিতা ভবন' বের করতে থাকে 'এক পয়সায় একটি' নামের চার আনা মূল্যের ষোলো পৃষ্ঠার কবিতা গ্রন্থমালা। মোট আঠারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এ সিরিজে। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' সিরিজটির উল্লেখ্য গ্রন্থ। ১৯৪৩ সাল থেকে 'কবিতা ভবন' থেকে প্রতিভা বসুর সম্পাদনায় ছোটো গল্প গ্রন্থমালাও বের হতে থাকে।

'কবিতা ভবন' প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা-সংকলন 'পদাতিক'

(১৯৪৩)। ১৯৪০-এর জুলাই মাসে এ সংস্থা প্রকাশ করে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামের কবিতা-সংকলন। সম্পাদক ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় সংকলনটির একটি নতুন সংস্করণ বের হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে।

ফ্যাসিবাদের ক্রমপ্রসার অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো বুদ্ধদেব বসুকেও করেছিল উদ্বিগ্ন। তাই ফ্যাসিবাদের বিস্তার রোধের চেষ্টায় গঠিত 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতি। ১৯৩৮-এর ২৪/২৫ ডিসেম্বর ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর দ্বিতীয় সর্ব ভারতীয় সম্মেলন হয়। সম্মেলন পরিচালনার জন্য গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব। অন্য তিন জন ছিলেন—মুলকরাজ আনন্দ (২০০৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)। বুদ্ধদেব বসু এই সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য : আধুনিক লেখকের অবস্থা' ('Bengali Literature Today : Position of Modern Writer') বিষয়ে। এ সংঘের ক্ষীণায়ু মাসিক পত্র 'প্রগতি'-তেও তিনি লিখতেন।

১৯৪২-এর ৮ মার্চ ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দর নৃশংস হত্যার অভিঘাতে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। লিখেছিলেন 'প্রতিবাদ' কবিতাটি; সই করেছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবাদ-বিবৃতিতে। 'প্রতিবাদ' সোমেন চন্দের স্মরণে প্রকাশিত 'প্রাচীর' কবিতা-সংকলনে মুদ্রিত হয়। তিনি 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' নামের পুস্তিকাও লিখেছিলেন। তবে সাহিত্যমনস্ক বুদ্ধদেব বেশি দিন প্রগতি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেননি; সরে এসেছিলেন নিজস্ব পরিমণ্ডলে।

পুস্তক তালিকা : স্বক্ষেত্র কবিতা হলেও উপন্যাস, ছোটো গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকথা, ছোটোদের জন্য গল্প-উপন্যাস কবিতা—সবই লিখেছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর গ্রন্থ সমূহের একটি বিষয়ানুক্রমিক ও কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল।

কবিতা-সংকলন :

১। 'মর্ম্মবাণী'; ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ২। 'বন্দীর বন্দনা'; ১৯৩০, ৩। 'একটি কথা'; ১৯৩২, ৪। 'পৃথিবীর পথে'; ১৯৩৩, ৫। 'কঙ্কাবতী'; ১৯৩৭, ৬। 'নতুন পাতা'; ১৯৪০, ৭। 'এক পয়সায় একটি'; ১৯৪২, ৮। '২২শে শ্রাবণ'; ১৯৪২, ৯। 'বিদেশিনী'; ১৯৪৩, ১০। 'দময়ন্তী'; ১৯৪৩, ১১। 'রূপান্তর'; ১৯৪৪, ১২। 'দ্রৌপদীর শাড়ী'; ১৯৪৮, ১৩। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'; ১৯৫৫, ১৪। 'বারোমাসের ছড়া'; ছোটোদের কবিতা, ১৯৫৬, ১৫। 'যে আঁধার আলোর অধিক'; ১৯৫৮, ১৬। 'দময়ন্তী : দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা'; ১৯৬৩, ১৭। 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'; ১৯৬৬, ১৮। 'এক দিন : চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা'; ১৯৭১, ১৯। 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা'; ১৯৭১।

অনুবাদ কবিতা-সংকলন :

১। 'কালিদাসের মেঘদুত'; ১৯৫৭, ২। 'ডাক্তার জিভাগো' (কবিতাংশ অনুবাদ ও সম্পাদনা); ১৯৬০, ৩। 'শার্লবোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'; ১৯৬১, ৪। 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা'; ১৯৬৭, ৫। 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা'; ১৯৭০।

সম্পাদিত কবিতা-সংকলন :

১। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'; ১৯৬৩।

কাব্যনাট্য :

১। 'কালসন্ধ্যা'; ১৯৬৯, ২। 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ'; ১৯৭০, ৩। 'সংক্রান্তি/প্রায়শ্চিত্ত : ইক্ষাকু সেন্নিন'; ১৯৭৩।

নাটক :

১। 'মায়া-মালঞ্চ' ('কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ); ১৯৪৪, ২। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'; ১৯৬৬, ৩। 'কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ'; ১৯৬৮, ৪। 'পুনর্মিলন'; ১৯৭০।

ভ্রমণ-নিবন্ধ :

১। 'সমুদ্রতীর'; ১৯৩৭, ২। 'আমি চঞ্চল হে'; ১৯৩৭, ৩। 'সব পেয়েছির দেশে'; ১৯৪১, ৪। 'জাপানী জার্নাল'; ১৯৬২, ৫। 'দেশান্তর'; ১৯৬৬।

গল্প-সংকলন :

১। 'অভিনয়, অভিনয় নয়'; ১৯৩০, ২। 'রেখাচিত্র'; ১৯৩১, ৩। 'এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে'; ১৯৩২, ৪। 'অদৃশ্য শত্রু'; ১৯৩৩, ৫। 'খাতার শেষ পাতা'; ১৯৪৩, ৬। 'হাওয়া বদল'; ১৯৪৫, ৭। 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা'; ১৯৪৫, ৮। 'গল্প-সংকলন'; ১৯৪৫, ৯। 'একটি কি দুটি পাখি'; ১৯৪৬, ১০। 'চার দৃশ্য'; ১৯৬২ বঙ্গাব্দ, ১১। 'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু'; ১৯৬০, ১২। 'হৃদয়ের জাগরণ'; ১৯৬১, ১৩। 'ভাসো আমার ভেলা'; ১৯৬৩, ১৪। 'তুমি কেমন আছো' (গল্প ও নাটিকা'); ১৯৬৭, ১৫। 'প্রেমপত্র'; ১৯৭২।

অনুবাদ গল্প :

১। 'পিরানদেল্লোর গল্প'; ১৯৪৪, ২। 'হাউই' (অস্কার ওয়াইল্ড-এর অনুবাদ); ১৯৪৪।

উপন্যাস :

১। 'সাড়া', ১৯৩৩, ২। 'অকর্ম্মণ্য বা একটি বাঙালী রুডিন', ১৯৩১, ৩। 'মন-দেয়া-নেয়া' ১৯৩২, ৪। 'যবনিকা পতন', ১৯৩২, ৫। 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ', ১৯৩২, ৬। 'সানন্দা', ১৯৩৩, ৭। 'আমার বন্ধু', ১৯৩৩, ৮। 'যেদিন ফুটলো কমল', ১৯৩৩, ৯। 'হে বিজয়ী বীর' ১৯৩৩, ১০। 'ধূসর গোধূলি', ১৯৩৩, ১১। 'অনেক রকম' (নাট্যোপন্যাস) ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (মার্জিত সংস্করণ 'ক্ষণিকের বন্ধু', ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), ১২। 'অসূর্যম্পশ্যা', ১৯৩৩, ১৩। 'একদা তুমি প্রিয়ে', ১৯৩৪, ১৪। 'সূর্য্যমুখী' ১৯৩৪, ১৫। 'রূপালি পাখি', ১৯৩৪, ১৬। 'লাল মেঘ' ১৯৩৪, ১৭। 'পরস্পর', ১৯৩৪, ১৮। 'বাড়ি-বদল', ১৯৩৫, ১৯। 'বাসর ঘর', ১৯৩৫, ২০। 'পারিবারিক', ১৯৩৬, (মার্জিত সংস্করণ 'দুই নদী এক ঢেউ', ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ২১। 'পরিক্রমা', ১৯৩৮, ২২। 'কালো হাওয়া', ১৯৪২, ২৩। 'জীবনের মূল্য', ১৯৪২, ২৪। 'অদর্শনা', ১৯৪৪ (মার্জিত সংস্করণ 'তুমি কি সুন্দর', ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), ২৫। 'বিশাখা', ১৯৪৬, ২৬। 'তিথিডোর', ১৯৪৯, ২৭। 'মনের মতো মেয়ে' ১৯৫১, ২৮। 'নির্জন স্বাক্ষর', ১৯৫১, ২৯। 'মৌলিনাথ' ১৯৫২, ৩০। 'শেষ পাণ্ডুলিপি', ১৯৫৬, ৩১। 'শোণপাংশু' ১৯৫৯, ৩২। 'নীলাঞ্জনের খাতা' ১৯৬০, ৩৩। 'পাতাল থেকে আলাপ', ১৯৬৭, ৩৪। 'রাত ভ'রে বৃষ্টি', ১৯৬৭, ৩৫। 'গোলাপ কেন কালো', ১৯৬৮, ৩৬। 'আয়নার মধ্যে একা', ১৯৬৮, ৩৭। 'বিপন্ন বিস্ময়', ১৯৬৯, ৩৮। 'বুকমি', ১৯৭২, ৩৯। 'এক বৃদ্ধের ডায়েরি' (মরণোত্তর) ১৯৮০, ৪০। 'প্রভাত ও সন্ধ্যা' (মরণোত্তর) ১৯৮০।

স্মৃতিকথা :

১। 'আমার ছেলেবেলা', ১৯৭৩, ২। 'আমার যৌবন', (মরণোত্তর), ১৯৭৬, ৩। 'আমাদের কবিতাভবন' (মরণোত্তর)।

কিশোর সাহিত্য

গল্প-সংকলন :

১। 'রঙিন কাঁচ', ১৯০৩, ২। 'ঘুম পাড়ানি', ১৯৩৩, ৩। 'সাগর-রহস্য' ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে)। ৪। 'কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড', ১৯৩৫, ৫। 'আজগুবি জানোয়ার', ১৯৩৬ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে) ৬। 'শনিবারের

বিকেল', ১৯৩৯, ৭। 'গল্প-ঠাকুর্দা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ৮। 'পথের রাত্রি', ১৯৪০, ৯। 'ঘুমের আগের গল্প', ১৯৪১, ১০। 'ভদ্রতা কাকে বলে', ১৯৪১, ১১। 'রান্না থেকে কান্না', ১৯৫৬, ১২। 'জ্ঞান থেকে অজ্ঞান', ১৯৫৮, ১৩। 'ছোটোদের ভালো ভালো গল্প', ১৯৬৩, ১৪। 'বই ধার দিয়ো না', ১৯৬৬, ১৫। 'হাসির গল্প'।

অনুবাদ গল্প :

১। 'অপরূপ রূপকথা' (দু খণ্ড) ১৯৩৫, (হান্স অ্যান্ডারসন-এর অনুবাদ), ২। 'স্বার্থপর দৈত্য', ৩। 'সুখী রাজপুত্র', ১৯৫৬, ৪। 'হ্যামেলিনের বাঁশিওলা', ১৯৬০।

উপন্যাস :

১। 'জলতরঙ্গ' (নাট্যোপন্যাস) ১৯৩৩, ২। 'অন্য কোনোখানে', ১৯৫০।

গোয়েন্দা উপন্যাস :

১। 'দস্যুর দলে ভোমরা', ১৯৪০।

২। 'ছায়া কালো কালো', ১৯৪২।

৩। 'ভূতের মতো অদ্ভুত', ১৯৪২।

৪। 'কালবৈশাখীর ঝড়', ১৯৪৫।

৫। 'তাসের প্রাসাদ', ১৯৫১।

যুক্ত রচনা :

১। 'বিসর্পিল' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে), ১৯৩৪।

২। 'বনশ্রী' (পূর্বোক্ত দুই লেখকের সঙ্গে), ১৯৩৪।

৩। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' (প্রতিভা বসুর সঙ্গে), ১৯৫৪।

৪। 'সাতনরী' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, রমেশ সেন ও রাধাকিঙ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে)।

প্রবন্ধ :

১। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', ১৯৩৫।

২। 'উত্তরতিরিশ', ১৯৪৫।

৩। 'কালের পুতুল', ১৯৪৬।

৪। 'সাহিত্য চর্চা', ১৯৫৪।

৫। 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', ১৯৫৫।

৬। 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি', ১৯৫৭।

৭। 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬৩।

৮। 'কবি রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬৬।

৯। 'প্রবন্ধ সংকলন', ১৯৬৬।

১০। 'মহাভারতের কথা' (মরণোত্তর), ১৯৭৪।

১১। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' (মরণোত্তর), ১৯৭৪।

১২। 'An Acre of Green Grass', ১৯৪৮।

১৩। 'Tagore : Portrait of a Poet', ১৯৬২।

৩.১ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার বুদ্ধদেব বসু বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেছিলেন। উপন্যাস কবিতা-সংকলন, গল্প-সংকলনের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা বেশি নয়—মাত্র এগারোটি। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশ, গল্প-সংকলন ও কবিতা সংকলনের সংখ্যা যথাক্রমে চুয়াল্লিশ ও পঁচিশ।

যুক্তির শৃঙ্খলিত বিন্যাস, বক্তব্যের বিশ্লেষণমুখ্য পরিবেশন, তথ্যসমৃদ্ধি প্রবন্ধের মূল শর্ত। রচয়িতার নিজস্ব উপলব্ধি প্রকাশের কোনো সুযোগ প্রবন্ধে নেই। বিশেষত প্রবন্ধে আবেগ সঞ্চারিত করে দেওয়া সহজ নয়। বুদ্ধদেব সেই কঠিন কর্মে সফল। কারণ তিনি যুক্তির তুলনায় উপলব্ধি ও রসবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর অনুভবপ্রধান প্রবন্ধ পাঠে জাগ্রত হয় পাঠকের সাহিত্যবোধ ; এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

তাঁর সমালোচনায় প্রধান হয়েছে মন্ময়তা, প্রাধান্য পেয়েছে স্বকীয় ধারণা। তবু স্বেচ্ছাচারী, শৃঙ্খলাহীন নয় তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য। বক্তব্যের পরিমিত, সংহত অথচ আবেগস্পন্দিত প্রকাশে ঋদ্ধ তাঁর প্রবন্ধ একই সঙ্গে তৃপ্ত করে পাঠকের হৃদয় ও মননকে। তাঁর আলোচনা বিশ্লেষণভিত্তিক। বিশেষ করে যখন তিনি বলেন প্রচলিত ধারণার বিপরীত কথা তখন তাঁর বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে দীপ্তিময়। তথাপি প্রবন্ধের প্রার্থিত নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। এই কারণেই তাঁর রচিত রম্য প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে এত আকর্ষক। অবশ্য রম্যতা এবং আকর্ষণীয়তা বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের সাধারণ লক্ষণ। তিনটি স্মৃতিকথা কয়েকটি ভ্রমণনিবন্ধ আর কিছু রম্য প্রবন্ধ লিখলেও সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনাই বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের মূল বিষয়। তাঁর প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'কবি সুকুমার রায়' প্রকাশিত হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'কল্লোল'-এ। প্রবন্ধটি সুকুমার রায়কে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৯), 'কবিতা' (১৯৩৫-১৯৬১)—ব্যতিক্রমী এই দুই পত্রিকার সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসুর প্রাবন্ধিক সত্তার বিকাশের অন্যতম কারণ। 'সাহিত্যচর্চা' (১৯৫৪)-র সব প্রবন্ধই 'কবিতা'-র জন্য লেখা হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমূহকে মূলত দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়—কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী সম্পর্কে অনুভব-গভীর আলোচনা, সাহিত্যের সমালোচনা। বুদ্ধদেব বসু আলোচনা করেছেন মধুসূদন, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কে। আধুনিক কবিতার পোষক এবং ধারক বুদ্ধদেব এ সম্পর্কেও লিখেছিলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ।

সাহিত্যিক এবং ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহে আছে তাঁদের সাহিত্য এবং শিল্পের বিস্তৃত সমালোচনা। আধুনিক কবিতা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা আছে তাঁর দুটি প্রবন্ধে, একটির ভাষা বাংলা, নাম 'আধুনিক কবিতার প্রকৃতি'; অন্য প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লেখা, নাম 'মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েট্রি' ('Modern Bengali Poetry')। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে তাঁর 'অ্যান অ্যাকর অব গ্রিন গ্রাস' ('An Acre of Green Grass', ১৯৪৮) সংকলনে। প্রবন্ধ দুটিতে আছে তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতা সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ। কবিতা উপভোগ ও পাঠকরুচি নির্মাণের নিদর্শন এই দুটি প্রবন্ধ। 'আধুনিক কবিতা' (১৯৫৪) নামের নিজের সম্পাদিত সংকলনের ভূমিকাপ্রবন্ধ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য

সংগ্রহের ভূমিকা এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'—এই তিন প্রবন্ধেও বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতির যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন।

'কালিদাসের মেঘদূত' (১৯৫৭)—স্ব-কৃত এই অনুবাদটির ভূমিকায় কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন বুদ্ধদেব।

'মহাভারতের কথা' (১৯৭৪) বুদ্ধদেব বসুর গভীর মনন ও নিবিড় অনুভবের ফসল। মহাকাব্য মহাভারত তাঁর লেখনীতে লাভ করেছে নতুন তাৎপর্য। আধুনিক দৃষ্টিতে মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্রের এরূপ ব্যাখ্যা আর কোনো বাঙালি প্রাবন্ধিক করেছেন কিনা সন্দেহ। 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ' সংকলনের 'রাজশেখর বসু' ও 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী' প্রবন্ধ দুটি বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনাশক্তির বিস্তৃতির পরিচায়ক। বিশেষত শিল্পের সঙ্গে শিল্পীরচরিত্রের আলোচনায় তিনি সফল।

অবশ্য মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সঠিক নয়। মধুসূদন নবজাগ্রত মানবতাবোধের উদ্দীপনা হেতু রাবণ-ইন্দ্রজিৎ-শূর্পণখাকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি বুদ্ধদেব বসু ঠিক মতো বোঝেননি। বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতির অসমতা ভেঙে দিয়ে মধুসূদন এনেছিলেন প্রবহমানতা—এ সত্য বুদ্ধদেব বসু স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে মধুসূদন একাজ সচেতনভাবে করেননি এবং তিনি অপচিত প্রতিভার উদাহরণ।

পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু শার্ল বোদলেয়ার (Charles Pieree Baudelaire : ১৮২১-১৮৬৭), রাইনার মারিয়া রিলকে (Rainer Maria Rilke : ১৮৭৫-১৯২৬) এবং হেল্ডারলিন আর তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা তিনটি এই তিন কবির বুদ্ধদেব-কৃত অনুবাদ-কবিতা সংকলনের ভূমিকা হিসেবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব সামগ্রিক আলোচনা করেছেন 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। রবীন্দ্র-কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষিত হয় গ্রন্থটিতে। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে আছে রবীন্দ্র-প্রেমের কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের সংবেদনশীল আলোচনা।

রবীন্দ্র-কবিতা নিয়েই বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনার শুরু। 'বাংলা ছন্দ', 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী', 'রবীন্দ্রনাথের গানে, পদ্য ও গদ্য'—তাঁর তিনটি উল্লেখ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধ তিনটিতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু রবীন্দ্র-গানে ছন্দোমুক্তির প্রয়াস সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের আলোচনা কালে বুদ্ধদেব ততটা শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর প্রধান মত রবীন্দ্র-উপন্যাসে কবি আর কথাশিল্পীর পূর্ণ সমন্বয় ঘটেনি। ফলে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের।

তিনি আরও বলেছেন প্লট নির্মাণ বিষয়ীবুদ্ধির কাজ আর কবিস্বভাবী লেখক এই কারণেই কাহিনি-কাঠামো নির্মাণে ততটা সফল হননি।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে যে ভিন্নতর প্রকরণের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব তা সমর্থন করেননি। তিনি 'চোখের বালি' (১৯০২)-কে বলেছেন সীমিত শক্তির উপন্যাস। অথচ 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসে সূচনা করেছিল ব্যক্তিত্বের সমস্যা যা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে ছিল অনুপস্থিত। 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)-র কৃত্রিমতা বুদ্ধদেব বুঝেছেন। কিন্তু তার কারণ যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বর্জন ও বহির্মুখী ঘটনার আধিক্য—তা তিনি বুঝতে পারেননি। 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬)-র সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর বিশ্লেষণ যথার্থ নয়। বুদ্ধদেব বসুর মতে 'গোরা' (১৯০৯), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) এবং 'যোগাযোগ' (১৯২৯)-ই রবীন্দ্রনাথের শিল্পসফল উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আছে নানা ত্রুটি। যেমন 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)-র গল্পাংশ দুর্বল; 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)-এ কবি মাঝে মাঝে আপন অভিজ্ঞতার বাইরে চলে গেছেন। 'দুই বোন' (১৯৩২) ও 'মালঞ্চ' (১৯৪২) দুটি উপন্যাসেই রয়েছে সংহতির অভাব।

বুদ্ধদেব রবীন্দ্র-সৃষ্টির সামগ্রিক আলোচনায় সফল। কিন্তু পৃথকভাবে বিশ্লেষণকালে আপন অনুভূতির উপর নির্ভরতা হেতু এসেছে ভ্রান্তি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উচ্ছ্বাস অসংগত নয়। ছোটো গল্পের একমুখী ভাব, সংকেতময় উপস্থাপন রবীন্দ্র-লেখনীতেই প্রথম নির্মিত হয়েছিল। ছোটো গল্পের উপযুক্ত ভাষাও তিনি সৃষ্টি করেছেন; সময় আর বিষয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর ভাষারও ঘটেছে পরিবর্তন—এসবই বুদ্ধদেব লক্ষ করেছেন। তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে রবীন্দ্র-ছোটো গল্পের আন্তর-সৌন্দর্য।

এখানেও কিন্তু বুদ্ধদেব কবি ও কথাশিল্পীর সমন্বয়-সূত্র সর্বদা রক্ষা করতে পারেননি। ছোটো গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবের সঙ্গে মানবমনের চিরন্তন বৃত্তির সংঘাত-জনিত চিত্র অঙ্কন করেছেন তা বুদ্ধদেব বসুর আলোচনায় ততটা স্পষ্ট হয়নি।

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫) বুদ্ধদেব বসুর অনুভবসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-সংকলন। প্রমথ চৌধুরী ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'-য় গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা বুদ্ধদেব বসুর এরূপ প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য—"এ জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান গুণ হচ্ছে তা কিছু প্রমাণ করতে চায় না কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চায় না।" সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনায় বুদ্ধদেবের উৎসাহ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা কম। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' তাঁর সাহিত্যতত্ত্বভিত্তিক একমাত্র প্রবন্ধ। 'দময়ন্তী' কবিতা সংকলনের প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩) কবিতার ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কিত একটি আলোচনা ছিল, পরবর্তী সংস্করণে তা বর্জিত হয়। তিনি লেখকের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রস্তুতি নিয়ে দু-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'কিসের জন্য আর্ট' এবং 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধ দুটিতে তিনি লেখকের সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে আত্মপ্রকাশের অনিবার্য প্রেরণা—সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'লেখার ইস্কুল' প্রবন্ধে তিনি লেখকের শিক্ষা, প্রস্তুতি ও শ্রমকে মূল্যবান মনে করেছেন। আবেগ এবং তার নিয়ন্ত্রণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুয়েরই আবশ্যকতা তিনি প্রমাণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অনুভবপ্রধান প্রাবন্ধিক। আপন উপলব্ধিকেই তিনি বিবিধ প্রকারে প্রবন্ধে রূপায়িত করেছেন। অবশ্যই তার সঙ্গে আছে যুক্তি ও তথ্যের সুমিত অন্বয়। প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটি শাখা রম্য প্রবন্ধ রচনায় সে জন্যই তিনি বিশেষ নিপুণতা অর্জন করেছেন। 'উত্তরতিরিশ' তাঁর এরূপ কুড়িটি রম্য প্রবন্ধের সংকলন।

৩.২ 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থপরিচয় ও প্রবন্ধপরিচয়

'উত্তরতিরিশ'-এর কুড়িটি রম্য প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ সাল। প্রবন্ধগুলি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৪৫-এ। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫২) যুক্ত হয় ১৯৪৭-এ লেখা দুটি প্রবন্ধ 'সবচেয়ে দুঃখের দুঘণ্টা' ও 'নোয়াখালি'।

'বেলে লেৎর্স'—এই ফরাসি সংজ্ঞাটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে রম্য রচনা। 'বেলে' কথাটির অর্থ মনোহর 'লেৎর্স'-এর অর্থ সাহিত্য। সংজ্ঞাটির ভিত্তি রচনাকৌশলের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আকর্ষক ভঙ্গিতে বিন্যস্ত লেখকমনের নানা চিন্তার উপস্থাপনই রম্য রচনা বা 'বেলে লেৎর্স'। প্রকৃত রম্য নিবন্ধকার গভীর মননের অধিকারী এবং তাঁর নিজস্ব অনুভব, লঘু ভঙ্গিতে উপস্থাপনে সক্ষম। সেই উপস্থাপনে তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের প্রতিফলন থাকা দরকার।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন মনন-গভীরতার অধিকারী এবং রম্যভঙ্গিতে স্বীয় অনুভবের লিপিচিত্রণে সক্ষম প্রাবন্ধিক। ফলত তাঁর লেখনীতে রম্য নিবন্ধ সহজেই অর্জন করেছে শিল্প-সফলতা। 'উত্তরতিরিশ' সংকলনের প্রথম প্রবন্ধের নাম **'উত্তরতিরিশ'**। এই নাম থেকে আহরিত হয়েছে গ্রন্থের নাম। এটি লেখকের একান্ত ব্যক্তিমনের চিন্তার ফসল।

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধটিতে যৌবনের তুলনায় প্রৌঢ়ত্বের অস্ত্যর্থক দিকগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যৌবনকে অনুভূতি-প্রাবল্যের জন্য স্বসৃষ্ট দুঃখের উৎস হিসেবে দেখেছেন এবং প্রৌঢ়ত্বের স্বস্তিময় স্বাধীনতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলেছেন।

তিনি আপন অনুভবকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। প্রবন্ধের শুরুতে আছে বয়োবৃদ্ধি সম্পর্কে মানুষের অসচেতনতার কথা। এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য যে বয়স যে বাড়ছে সে সম্পর্কে পারিপার্শ্বিকই মানুষকে সচেতন করে দেয়। তরুণরা করে শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ ব্যবহার, অথবা তাদের ক্রুদ্ধ অপমানাত্মক ব্যবহারেও জড়িয়ে থাকে বয়সের অনুষঙ্গ।

বাল্যসঙ্গীদের বয়স্কমুখ আর ব্যবহারও ব্যক্তিকে সচেতন করে অপগত যৌবন সম্বন্ধে। এ অভিজ্ঞতা কেবল লেখকের নয়—প্রায় সব মানুষের।

এর পরের অংশে বুদ্ধদেব বসু যৌবনের দুর্বলতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা কারণহীনভাবে যৌবনের স্তুতি করে থাকেন। বিশেষ যুবতী নারীর বন্দনায় চিরদিনই কবিগণ মুখর। অথচ নারীর যৌবন নিছক একটি জৈবিক ব্যাপার। কবিদের বক্তব্য যৌবন ক্ষণিকের বলেই তা মূল্যবান এবং যুবতী নারীর মধ্যে প্রকৃতির আদিম প্রাণশক্তির প্রকাশ লক্ষিত হয় বলেই তা বন্দনীয়।

বুদ্ধদেবের মতে যৌবন-বন্দনা করেছেন বিশ্বের বহু কবি। তবে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। কারণ তিনি যৌবনের সত্যকে উপলব্ধি করেছেন।

নিবন্ধের পরের অংশে রয়েছে বুদ্ধদেবের মূল বক্তব্য। তাঁর মতে যৌবনে অনুভূতির অতিরেক মানুষকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয় না। আপন শক্তি সম্বন্ধে তার বিশ্বাস বাস্তবের সংঘাতে বারে বারে ভেঙে যায়। সংযমের অভাবে মনের কথা উপস্থাপনে সে অক্ষম। বয়স্কদের শাসনে তার বিশ্বজগতের সঙ্গে নব পরিচয়ের কামনা পূর্ণ হয় না। আর সংবেদনশীলতার আধিক্যহেতু এসব বাধা তার মনকে করে তোলে বেদনার্ত।

আসলে মানুষ উপলব্ধি দিয়ে বিশ্বকে গ্রহণ করে। সুখ-দুঃখ তার উপলব্ধির ফল। তাই কোনো মানুষই কোনো বয়সেই পূর্ণ সুখী নয়।

তথাপি যৌবন অপেক্ষা প্রৌঢ়ত্ব কাঙ্ক্ষণীয়। কারণ তারুণ্যের অনুভূতির প্রাবল্য হেতু আসে দুঃখ। প্রৌঢ়ত্বে আসে তা দমনের ক্ষমতা। পরিণামে সুখ যায় বেড়ে। তাই বুদ্ধদেব প্রৌঢ়ত্বকে বলেছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং উপভোগ্য সময়। দেহ ও মনের শক্তি তখন পূর্ণতা পায়, শেখা যায় মানস শক্তির যথাযথ ব্যবহারের কৌশল। পাওয়া যায় উপার্জন ভিত্তিক সার্বিক স্বাধীনতা।

অনুভব-প্রাবল্য যৌবনের দুঃখের উৎস। পরিণত বয়সে বুদ্ধি হয় সংযত শক্তিমান; কিন্তু হৃদয়-অনুভব ও উৎসাহ হয় দুর্বল। প্রৌঢ়ত্ব তথা মধ্যবয়স উভয়ের মিলনস্থল। এ বয়সে জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল ও আনন্দবোধ ক্ষীণ হয় না। অথচ অনর্থক অনুভূতি-বাহুল্য তখন লুপ্ত। বরং অনুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ, উৎসাহ-উজ্জ্বলতার সঙ্গে বুদ্ধির দৃঢ়তার মিলনে মন হয়ে ওঠে শক্তিমান। হৃদয়ানুভবকে জীবনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করা যায় প্রৌঢ়ত্বে। বুদ্ধদেব এ ব্যাপারটিকে নিজের বোধ দিয়ে জেনেছেন।

নব যৌবনে বিশ্বের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আনন্দে আচ্ছন্ন থাকে মন। ফলে বুদ্ধির মুক্তি হয় ব্যাহত। মধ্য বয়সে রূপ-উপভোগের সচেতন ক্ষমতা জাগ্রত হয় মনে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তারুণ্যের অভিজ্ঞতা। ফলে বস্তুর যথার্থ রূপ জানা যায়; অনুভব করা যায় তার সৌন্দর্য।

প্রৌঢ় বয়সে পাওয়া যায় পরিণতির সুখকর সম্ভাবনা আর তারুণ্যের ভাববিহ্বলতা নির্লিপ্তভাবে গ্রহণের ক্ষমতা।

১৯৪২-এ রচিত প্রবন্ধটিতে মূলত আপন প্রৌঢ়ত্বজনিত আনন্দ ও যৌবনের আবেগ-উন্মাদনাজাত দুঃখের বিশ্লেষণই মুখ্য। সমকালের যুদ্ধ, গর্জিত আন্দোলন কম্পিত সময়ের ছায়া প্রবন্ধটিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

'নব বসন্ত' 'উত্তরতিরিশ'-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধ। ১৯৪৩-এ রচিত এ প্রবন্ধের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে জীবনের, অস্তিত্বের ক্ষয়হীনতার, চিরন্তনত্বের দিকটির উপস্থাপন। প্রকৃতির ঋতুপরিবর্তনকে বন্ধ করতে পারেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ, রুদ্ধ হয়নি মানুষের আনন্দিত হওয়ার শক্তি। বুদ্ধদেব বসু বসন্তপ্রভাতের আনন্দের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছেন সেই সত্য এবং সে অনুভূতিকে দিয়েছেন ভাষারূপ। প্রবন্ধটিতে রম্য লঘু ভঙ্গিতে মানুষের বিনাশহীন অস্তিত্বের সত্য উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে জাপানের বর্মা আক্রমণের সময়ে মানুষ বোমার আতঙ্কে দলে দলে কলকাতা ত্যাগ করেছিল। কলকাতার বোমাহীন সুস্থতা আর স্থানান্তরে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে তারা ফিরে আসে কলকাতায়। তারপরেই কলকাতায় বোমা পড়ে। কিন্তু মানুষ আতঙ্কিত হয় না। বিপদ যখন সম্ভাব্য ছিল তখন তার ভীষণতা ছিল প্রবল, যখন তা সত্য হয়ে দেখা দিল তখন মানুষ তাকে গ্রহণ করল সহজে। এর কারণ মানব-প্রকৃতির সম্প্রসারণধর্মী সহনশীলতা। যুদ্ধ, বিপ্লব, রক্তপাতের সম্ভাবনায় ভীত হয় সে। কিন্তু তাদের সম্মুখীন হয়ে মানুষ নিঃশেষে বিনষ্ট হয় না। সকল রক্তপাত, সমস্ত ধ্বংস তুচ্ছ করে উঠে আসে নবীন জীবন। ব্যক্তিমানব ধ্বংস হয় কিন্তু মানবজাতিকে মুছে দিতে পারে না কোনো মানবিক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাই সামূহিক বিনাশের মধ্যেও মনে থাকে এ আশ্বাস যে জীবন আবার তার স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হবে। বুদ্ধদেব বসুর মতে মানুষ অমর, কারণ সব মানুষ একসঙ্গে মারা যায় না। মানুষ দুঃখজয়ী—কারণ সে সর্বদা দুঃখে অভিভূত থাকে না। লেখকের মতে এর কারণ মানুষের মনের গঠন এমন যে কোনো বিশেষ প্রবণতা স্থায়ী হয় না তার মনে। আবার প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে প্রতি মানুষের মনে সব সময় একই প্রবণতা ক্রিয়াশীল থাকে না। তাই পথে দাঙ্গা চললেও ঘরে বসে কিছু মানুষের সাহিত্যালোচনা বিঘ্নিত হয় না।

বুদ্ধদেব অনুভব করেছেন মানুষ কোনো কোনো ব্যাপারে প্রকৃতির অধীন এবং তার দুঃখ সহ্য করার কারণ এই অধীনতা। দুঃখের প্রথম আঘাতে বিহ্বল হয় মানুষ। কিন্তু দ্রুত সে ফিরে পায় স্বাভাবিকতা। প্রিয় বিষয়ে উন্মুখ হয়ে ওঠে সে। ব্যক্তিজীবনের শোক-দুঃখের মতো সমষ্টিজীবনকে আঘাতকারী যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধেও একথা সত্য। প্রথম আঘাতের পর মানবসমাজ হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। এভাবেই দুঃখের উপর জয়ী হয় মানবস্বভাব।

মননশীলতার কারণে প্রাণীজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জীবনের ক্রমপ্রবাহ যা প্রাণকে করে অমর—সেখানে সে কিছু জৈব নিয়মের অধীন। নারীপুরুষের পারস্পরিক টান বা বসন্ত-সময়ের মনের উদ্দীপনা—দুটিই জৈব নিয়ম। প্রকৃতির এই অপ্রতিরোধ্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ জীবনকে করে তোলে চিরন্তন। তাই মানবজীবন অতিক্রম করে দুঃখের সাময়িক প্রবলতা। ব্যক্তিমানব আর মানবসমাজ—উভয় ক্ষেত্রেই এটি সত্য।

দুঃখভোগের কঠোরতার মধ্যেও প্রকৃতির নিয়ম আর ব্যক্তিমনের অনুভব থাকে অপরিবর্তিত। প্রাণধারণের ভিত্তি এই সত্য। তাই যুদ্ধের সংকট-ক্ষণেও প্রকৃতির রূপ নাড়া দেয় তার মনকে; তরুণ আকৃষ্ট হয় তরুণীর প্রতি। যথা নিয়মে চলে ঋতুর পরিবর্তন। এ থেকে বোঝা যায় উপস্থিত বিপদের বাইরেও এমন কিছু আছে যা চিরদিনের। ঘটনার ওঠানামার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। মানুষের প্রাণের সঙ্গে আছে তার অদৃশ্য অচ্ছেদ্য যোগ। সেই যোগই সর্ববিধ সংকটের মধ্যে মানুষকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ রাখে।

লেখক অনুভব করেছেন ব্যক্তি-মানুষের বিরাট বিশাল শ্রমের ফল প্রায়ই ক্ষয়প্রবণ ও পরিবর্তনশীল। তেমনই ক্ষয়প্রবণ প্রসিদ্ধ সব সমরনায়ক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব। উপস্থিত সময়ের পরে তারা হয়ে যাবে ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য। সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে সভ্যতা; টিকে থাকে মানুষ। তারই সঙ্গে টিকে থাকে সন্তানস্নেহ, সৌন্দর্যদর্শনের তৃপ্তি, সাহিত্য সৃষ্টির আনন্দের মতো চিরদিনের আনন্দ। স্রষ্টা কবি হিসেবে বিনাশাতীত

সাধারণ জীবনের একজন হিসেবে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালের বৈনাশিকতার মধ্যে শীতের শেষে আগত বসন্ত দিনের মধ্যে বুদ্ধদেব শুনেছেন এই বাণী।

প্রবন্ধের শেষাংশ রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' আর জীবনানন্দ দাশের 'ক্ষেতে প্রান্তরে' ('সাতটি তারার তিমির' : ১৯৪৮) ও 'পৃথিবীলোক' কবিতায় অনুরূপ ভাবনার ছায়া লক্ষিত হলেও এ অনুভব একান্তই বুদ্ধদেবের ব্যক্তিমনের অনুভব।

১৯৪৩ সালে রচিত প্রবন্ধটির আর এক বিশেষত্ব সময়ের ছায়া—যা বুদ্ধদেবের অনেক রম্য প্রবন্ধেই অনুপস্থিত।

'বড়ো রাস্তায় ছোটো ফ্ল্যাট'—১৯৪৩ সালে লেখা প্রবন্ধটি একান্তই বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব অনুভবের ফসল। রাসবিহারী এভিনিউ—কলকাতার এই বড়ো রাস্তার দুশো দুই নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাট-এ ছিল তাঁর বাস। সে বাড়ি থেকে দেখা যেত রাস্তায় চলমান জীবন-প্রবাহ। নগরবাসী হয়েও একটু বিচ্ছিন্ন থেকে নারী, শিশু, বেকার, চাকুরে—বহু মানুষের পথচারণের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন বিচিত্রস্বাদী জীবনের উজ্জ্বল রূপ এবং সিনেমা দেখার মতো আনন্দ উপভোগ করতেন।

তারপরে এল পঞ্চাশের মন্বন্তর, এল কনট্রোল। চাষিদের ফসল কৌশলে দখল করে তা মূল্যের বিনিময়ে তাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হল; উদ্দেশ্য দুর্ভিক্ষ-রোধ। এবার ফ্ল্যাট-এর বারান্দা থেকে তিনি দেখতে পেলেন গ্রাম বাংলার বাস্তব চিত্র। কলকাতার দক্ষিণের গ্রাম থেকে দলে দলে নানা বয়সের নারী আর কয়েকজন বৃদ্ধ অন্নের সন্ধানে এল কলকাতায়। বুদ্ধদেবের চোখে পড়ল ফুটপাথে সংসার গড়েছে তাদের অনেকে। রাত থেকে লাইন করে শুয়ে আছে কনট্রোল দোকানের সামনে। উদ্দেশ্য দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে চাল সংগ্রহ। সেই স্বল্প সম্বলে তাদের ক্ষুধা মেটে না। খাদ্য সংগ্রহের একাগ্র নিষ্ঠায় তারা সন্ধান করে প্রতি গৃহ; ভিড় করে উৎসব-প্রাঙ্গণে। তথাপি তাদের জীবনে আছে আনন্দের অবকাশ; পারস্পরিক সহায়তা, শিশুর হাসি, আর গল্পকৌতুকের অবসর।

আবার নানা বয়সের বেশ কিছু বধূ, কন্যা, প্রৌঢ়া কলকাতার দক্ষিণের গ্রামগুলি থেকে রাত্রির শেষ প্রহরে কনট্রোল-প্রদত্ত চাল পাওয়ার জন্য ভিড় করে কলকাতায়। সঙ্গে তাদের থাকে শিশু। তাদের স্বামী, পিতা, ভ্রাতাদের সারা দিনের শ্রমে পাওয়া টাকা নিয়ে তারা আসে নগর কলকাতায়। অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে নানা ক্লেশ সয়ে তারা ফিরে যায়। দিনের শেষ থেকে রাত্রির অনেকটা সময় জুড়ে অব্যাহত থাকে চালের পুঁটলি কাঁধে তাদের ঘরে ফেরার পালা।

বুদ্ধদেব বোঝেন এরাই যথার্থ দেশ। এইসব মেয়েরা দরিদ্র হলেও ভদ্র গৃহস্থ। বেঁচে থাকার দায়ে পথে নামলেও তাদের মুখে আছে ভদ্রতার অবশেষ। জীর্ণ পরিচ্ছদে সুচারুভাবে লজ্জা আবৃত করার কৌশল তাদের জানা। সুপ্রসাধিত 'বালিগঞ্জিনী'-কে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে লেখকের মন। যদিও তাঁর বুদ্ধি বলে ওই জীর্ণ চীর পরা নারীকঙ্কালগুলিই বাংলা দেশের যথার্থ প্রতিরূপ। তবু তাদের সঙ্গে একাত্মতার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনযাত্রার মার্জিত পদ্ধতি। তিনি শুধু দর্শকের মতো দূর থেকে দেখতে পারেন এদের মন থেকে মুছে যায়নি মানবিকতা। হারানো সন্তানের খোঁজে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা। মুহূর্তের আনন্দে হেসে ওঠে। তাদের শীর্ণ শিশুর দলও চাঁদ ধরার স্পর্ধা দেখায়। এভাবেই তারা অতিক্রম করে যায় অবস্থার দারিদ্র্যকে এবং বিস্মিত লেখক বুঝতে পারেন এ বৈপরীত্যের কারণ। তাঁর মনে হয় এর কারণ জীবনের স্বাভাবিক টিকে থাকার নিয়মের মধ্যে নিহিত। ১৯৪৩-এ লেখা প্রবন্ধটিতে রয়েছে সমকালের রুদ্র রূপের সপ্রাণ ভাষাচিত্র।

'খাকি' নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু মূলত নির্দিষ্ট পেশার নির্দিষ্ট পোশাকের বর্ণের দোষগুণ বিশ্লেষণ করেছেন। পোশাকের সঙ্গে মনোভাব ও আচরণের সম্পর্কও তাঁর চোখ এড়ায়নি। প্রবন্ধটির উৎস নির্দিষ্ট বাস-এ খাকি পোশাক পরা পাঁচ যুবকের অভব্য আচরণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে যুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু আধা সামরিক অস্থায়ী কর্মের সৃষ্টি হয়। এসব পদে যারা নিযুক্ত হয় তাদের বেশির ভাগ ছিল অমার্জিত স্বভাব, শিক্ষাহীন, শোভনতাহীন রাস্তার 'ছোঁড়া'। সব দেশের সব বড়ো শহরেই থাকে এরূপ যুবক দল। দুর্ব্যবহারের জন্য তারা কুখ্যাত। তথাপি লেখকের মতে কলকাতা, ঢাকা, লখনউ—প্রভৃতি এদেশের বৃহৎ নগরের এই 'ছোঁড়া'রা যতদিন ধুতি, লুঙি, পাজামা পরত; ততদিন পোশাকের শালীনতা তাদের আচরণকে দুঃসহ করে তুলত না। কারণ দীর্ঘ পরাধীনতা অথবা স্বভাবনম্রতার কারণে এ দেশীয়দের পোশাকে, আচরণে, আলাপে থাকে শান্তভাব। এরপর বুদ্ধদেব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বভাবের তুলনা করেছেন। পাশ্চাত্যের মতো প্রাচ্যবাসীর মনোভাব মুখমণ্ডলে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় না। স্বভাবচঞ্চল পাশ্চাত্য জাতির প্রবল প্রাণশক্তি বিশ্ব জয় করেছে। স্বভাবের শান্ততা প্রাচ্যের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেছে। পাশ্চাত্যের ভালো ও মন্দ-উভয়ের মধ্যে আছে অতিরেক। প্রাচ্যের ভালো যেমন অত্যুত্তম নয়; মন্দও তেমনই অত্যন্ত খারাপ নয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড় সব কিছু পালটে দিয়েছে। চাহিদার কারণে আধা সামরিক পদে নিযুক্ত হয়েছে রাস্তার 'ছোঁড়ারা'। কাটাছাঁটা খার্কি উর্দির স্পষ্টতা উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাদের অবয়ব আর চরিত্রের বর্বরতা। অশিক্ষার সঙ্গে সামরিক ঔদ্ধত্যের সংযোগে তাদের মনুষ্যত্ব চূর্ণ হয়েছে। আপনাদের হীনতা সম্পর্কে লজ্জার যে আভাস ছিল তা গেছে মুছে। প্রভুশক্তির কুৎসিত অনুকরণে এরা বিজয়ী ও বিজিত উভয়েরই লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব খাকি পোশাক সম্পর্কে আপন মনোভাব বিশ্লেষণ করেছেন। বুয়র যুদ্ধের সময় আত্মগোপনের প্রয়োজনে আফ্রিকার মাটির রঙের সাদৃশ্যে সামরিক পোশাকের রং হিসেবে নির্বাচিত হয় এই অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল রং। আধুনিক যুদ্ধের উন্নত হত্যাকৌশল খাকির এই আত্মগোপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে। তথাপি যুদ্ধের রং হিসেবে চারদিকে দেখা দিয়েছে খাকি রঙের আধিক্য। বাঙালি মেয়েরা নারীবাহিনীতে যোগ দিয়ে পরছে খাকি শাড়ি। শৌখিন যুবকেরা ফ্যাশন হিসেবে পরছে খাকি ইজের আর ঝোপকামিজ (বুশ শার্ট)।

তিনি খাকিকে বলেছেন মানবিক অনুভব বর্জিত নৈর্ব্যক্তিক রং। যুদ্ধের সঙ্গে যদি ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি মানবিক বৃত্তি জড়িত না থাকে তবে তা থামার সম্ভাবনা কম। ক্রোধ-ঈর্ষাজাত যুদ্ধ একদিন অবসিত হয়। কুরুপাণ্ডব বা রামরাবণের যুদ্ধ তাই থেমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে নেই তেমন কোনো হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক; যুদ্ধ হচ্ছে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের। ট্যাঙ্ক, বোমা, মেশিনগানের মতো মানুষও সেই যুদ্ধের উপকরণ মাত্র। এই যুদ্ধের নিয়ন্তারা আছে নেপথ্যে; তাদের পারস্পরিক কূটচাল অনুযায়ী চলছে যুদ্ধ। আধুনিক জগতের আবিষ্কার এই ক্রোধহীন নৈর্ব্যক্তিক অ-মানুষিক যুদ্ধ। সেই অ-মানুষিক সংগ্রামের প্রতীক খাকি রঙের উর্দি।

শাসক ইংরেজ এনেছে এই নিকৃষ্ট রং। তাই খাকির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভীতি। সে কারণে খাকি-পরিহিতদের সঙ্গে থেকে যায় একটা দূরত্ব।

এরপরে বুদ্ধদেবের বিচার্য এই রংটির শিল্পগুণ। তাঁর মতে শ্বেতকায়দের খাকি পোশাক তেমন কুৎসিত মনে হয় না। কিন্তু বাঙালির তৈলাক্ত তাম্র ত্বকের পক্ষে খাকি অশোভন।

যামিনী রায়ের স্বাধীন ভারতের সৈন্যদের পোশাকের রং সম্বন্ধে চিন্তাকে তেমন গুরুত্ব দেননি বুদ্ধদেব। খাকির ব্যাপ্তির সম্মুখীন হয়ে তিনি বুঝেছেন সে চিন্তার গুরুত্ব। তাঁর মতে সৈনিক, পিয়ন, লিফটম্যান—এইসব কর্মীদের পোশাকে খাকির বদলে আসুক অন্য রং। কোর্তা পাতলুনের স্থান গ্রহণ করুক পাজামা পাঞ্জাবি, এর ফলে কর্মীদের সঙ্গে স্থাপিত হবে জনতার হৃদয়ের সম্পর্ক। উদাহরণ হিসেবে তিনি লন্ডন এবং দেশীয় পুলিশের পোশাকের তুলনা করেছেন। পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে লন্ডন পুলিশের পোশাক; তাই তারা হয়ে উঠেছে মানুষের বন্ধু। আর লাল পাগড়ি খাকি কোর্তা, কামিজ পট্টি আর জুতো পরা দেশীয় পুলিশকে মানুষ ভয় করে এবং জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পোশাকের রং যদি হয় খাকির বদলে সাদা, গেরুয়া বা বৌদ্ধদের মতো পীত; তবে সহজেই নিরাপত্তা

কর্মী, পুলিশ, সৈন্য—সবার সঙ্গে স্থাপিত হবে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক। পারস্পরিক সেই ঘনিষ্ঠতার অনুভবে জীবন হয়ে উঠবে সহনীয়।

১৯৪৩-এ রচিত এ প্রবন্ধ সমকালের অভিঘাতে স্পন্দিত বুদ্ধদেব বসুর সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রকাশে হয়ে উঠেছে সুন্দর।

'জিনিস' নিবন্ধটির রচনাকাল ১৯৪৩। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার একটি ভিন্নধর্মী বিশ্লেষণ আছে এ নিবন্ধে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ সত্য যে অর্থ নয়—জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন দেহ-মনের পুষ্টিসাধক বস্তুসমূহ।

অনুভব-অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই সত্য উপলব্ধি করেছেন লেখক। আগে স্ত্রীর জিনিস অর্থাৎ বিবিধ দ্রব্য ক্রয়ের ঝোঁককে তিনি কারণহীন বলে মনে করতেন। যদিও দেখা যেত সামান্য অ্যাসট্রে কি টেবিলঢাকা মনকে করতে পারে সঞ্জীবিত। আবার যে দ্রব্য বাহুল্য মনে হয়েছিল সহসা প্রয়োজনের মুহূর্তে সে হয়ে ওঠে পরম সহায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখক বুঝতে পারেন দ্রব্য বা জিনিসই মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। চাল, চিনি, বসন, বাসন, কাগজ, কয়লা, কলম, আলপিন—মানুষের জাগতিক আর মানসিক উভয় অস্তিত্বের মূলে আছে এইসব ছোটো-বড়ো জিনিস। অর্থের বিনিময়ে এদের সংগ্রহ করা যায়—এখানেই অর্থের মূল্য। অথচ সাধারণ মানুষ অর্থকেই মনে করে পরমার্থ, জিনিসকে করে উপেক্ষা।

ধনবিজ্ঞানীরা বলেন অর্থ উপভোগ-উপকরণ ও উপায় আয়ত্তে আনার মাধ্যম। তাই সভ্য মানুষের অর্থ সংগ্রহের অভীপ্সা এত প্রবল। বাস্তবে কিন্তু অর্থকেই বড়ো মনে করে মানুষ; তাই অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে পাওয়া বস্তুকে সে তুচ্ছ মনে করে। ধনী মূল্যবান বস্তুসমূহ সংগ্রহ করে ব্যবহারের কারণে বা প্রীতির প্রেরণায় নয়-ধনের ঘোষণা রূপে। বস্তুতন্ত্রের এই নিকৃষ্ট রূপ যখন দেখা দেয় তখনই আসে তার ধ্বংসের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এনেছে সেই জড়বাদ-ধ্বংসকারী বিপ্লব; মানুষ আজ বুঝেছে ধন বা অর্থ নয় মানুষের যথার্থ প্রয়োজন অর্থের বিনিময়ে লব্ধ বস্তু।

বুদ্ধদেব বসু লিখছেন আধুনিক দার্শনিক—বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Arthur Russell : ১৮৭২-১৯৬৯) কোনো এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন আধুনিক অর্থনীতির বিকৃতি হেতু মানুষ জিনিস কিনে টাকার জন্য দুঃখিত হয়। যুদ্ধকালে জিনিসের দুর্লভতা বুঝিয়ে দেয় রাসেল-এর উক্তির যথার্থতা। ক্রয়বিক্রয়ের প্রক্রিয়ায় এক পক্ষ পায় অর্থ অন্য পক্ষ পায় বেঁচে থাকার উপকরণ। উভয় পক্ষই এর ফলে হয় উপকৃত। কিন্তু এতদিন ক্রেতার মনোভাবে ছিল অনুগ্রহের আধিক্য। যুদ্ধ পালটে দিয়েছে সেই চিত্র। এখন বিক্রেতা জিনিস দিয়ে ক্রেতাকে করছে অনুগ্রহ।

লেখক অনুভব করেছেন মধ্যবিত্ত জীবনে এর ফলে আসেনি তেমন কোনো পরিবর্তন। জিনিস যখন সুলভ ছিল তখন তার হাতে ছিল না অর্থ; আর অর্থ যখন সুলভ হল তখন জিনিস হল দুর্লভ। ফলে তাদের অবস্থা রইল একই রকম।

মানুষ কেমন করে সঠিকভাবে তার প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারে তা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে চলছে পরিকল্পনা। যদিও তার সুফল নিহিত দূর ভবিষ্যতে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে জিনিসহীন বাজারে ক্রেতাকে দেওয়া হচ্ছে জিনিসের যত্নের উপদেশ।

লেখকের মতে এর ফলে জিনিসের প্রতি জাগছে ভালোবাসা আর জিনিস-উৎপাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এই সংকটের ফলে ব্যবহার্য জিনিসের সঙ্গে মানুষের একটি সহজ অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধ গড়ে উঠছে। জীবনকে পূর্ণ করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে জিনিস—তিনি বুঝেছেন এ সত্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন তাঁর কলমের কথা। দুঃখ-সুখের সঙ্গী কলমটি দুষ্প্রাপ্যতা আর মহার্ঘতার কারণে হয়ে উঠেছে প্রিয়তর।

এভাবেই যুদ্ধের কারণে জাত মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে জিনিসের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে।

'ব্ল্যাক আউট' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে লিখিত একটি মন্ময় প্রবন্ধ। রচনাকাল ১৯৪১-এর জুন। সম্পূর্ণ অনুভব-উজ্জ্বল ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্ল্যাক আউট-এর কারণে কলকাতায় সাধারণত দুর্লভ রাত্রির রূপ চিত্রিত হয়েছে। বিদ্যুতের চড়া আলো কলকাতা থেকে কেড়ে নিয়েছিল অন্ধকার রাত্রির সৌন্দর্য, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর রূপ। যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপতার নির্দেশের কারণ পথে জ্বলত না আলো। ফলে রাতে ঘরের মধ্যে ঘুমের জন্য নিটোল অন্ধকার হয়েছিল সুলভ। পথে পথে আলোয় বিক্ষত অন্ধকার ফিরে পেয়েছিল তার পূর্ণ রূপ। সে অন্ধকার কখনও বিস্তৃত, ব্যাপ্তিতে দীপ্ত কখনও বা 'স্নিগ্ধ চিক্কণ'। বাস্তবে অসুবিধা সত্ত্বেও এর ফলে সৌন্দর্যবোধ হয় তৃপ্ত। আর চাঁদ-ওঠা রাতে শহরের কঠিন পথ হেসে ওঠে নীলাভ জ্যোৎস্নার স্পর্শে; গাছের পাতায় জ্বলে জ্যোৎস্নার হিরে-মুক্তো। আকাশে দেখা মেলে মেঘ-আলো-করা টুকরো চাঁদের মুচকি হাসির; মেঘহীন আকাশে দেখা যায় তারা।

নগরে বিশেষত কলকাতার মতো বড়ো নগরে মানুষ বঞ্চিত হয় প্রকৃতির রূপ আর স্পর্শ-গন্ধ-ধ্বনি থেকে। ব্ল্যাক-আউট এনে দিয়েছে সেই সুযোগ।

কিছুদিন অবশ্য এই অন্ধকারের নিস্তব্ধ শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল ট্রাফিক-এর গোলমালে আর জনতার কোলাহলে। বুদ্ধদেব এখানে প্রকাশ করেছেন আপন মত। তাঁর মতে পালটে দিতে হবে দিনের কর্মসময়। ভোর ছ টায় শুরু হয়ে বেলা দুটোয় শেষ হবে কাজ। সন্ধ্যে হতেই সবাই শুয়ে পড়বে; ট্রাম-বাস যাবে থেমে। ব্ল্যাক-আউট-এর ফল প্রকৃতিরূপ-উপভোগের সুযোগ তখন পুরোপুরি পাওয়া যাবে। তবে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা-ও কম নয়। কিন্তু শীঘ্রই পরিস্থিতি পালটে গেল। দেখা দিল জ্বালানি তেলের অভাব; বাস-ট্যাক্সি হল দুর্লভ; পথে জনসমাগম হ্রাস পেল। ট্রামের শব্দ ভিন্ন গভীর স্তব্ধতায় আপন স্বরূপে প্রকাশ পেল প্রকৃতি। এই প্রাপ্তিতে তৃপ্ত বুদ্ধদেবের কবি মন।

অনুভবের উষ্ণ স্পর্শ প্রবন্ধটিকে করে তুলেছে মনোরম। রম্য প্রবন্ধের সার্থক দৃষ্টান্ত 'ব্ল্যাক আউট'।

তির্যক দৃষ্টিতে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখা রম্য প্রবন্ধ 'প্রোফেসর', লেখক বুদ্ধদেব বসুর মতে প্রোফেসর একটি বিশেষ শ্রেণির জীব। বালককাল থেকেই তিনি গুরুজনবাধ্য, পুস্তক-মনস্ক, বিলাসবর্জিত, নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি। পরীক্ষায় ভালো ফল করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি পাঠ করেন গ্রন্থ। পুস্তক পাঠের আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত।

জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনেও তিনি থাকেন অচল। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, গল্প করা, সহপাঠিনীর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ—কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করেনি। পরীক্ষা পাসের লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি তিনি পাঠ্য বই পড়েছেন আর করেছেন অধ্যাপকদের তুষ্ট করার চেষ্টা। আপন স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশকে প্রাণপণে রোধ করে তিনি একমনে পড়েছেন পাঠ্য বই আর সমালোচনা-গ্রন্থ।

পরীক্ষায় ভালো ফল করার কঠিন সাধনায় সফল হলেন তিনি; পেলেন কাঙ্ক্ষিত প্রোফেসরি। ক্রমে তিনি লাভ করলেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি, করলেন গবেষণা—পেলেন পিএইচ. ডি. ডিগ্রি। এসবের পুরস্কারস্বরূপ উচ্চপদ লাভ করলেন তিনি। তাঁর শেষ আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের পদ প্রাপ্তি।

প্রবন্ধের পরের অংশে বুদ্ধদেব গবেষণাকে বলেছেন উন্নত কেরানির কাজ। তাঁর মতে প্রচুর বই নাড়াচাড়া করে সনতারিখ যুক্ত তালিকা তৈরি বা বহু দেশি-বিদেশি পণ্ডিতের মতামত চয়ন করে একত্রিত করার নামই গবেষণা। গবেষণা সৃষ্টির আনন্দহীন একটি কাজ। সৃষ্টির আনন্দ অনুপস্থিত বলেই এ কাজে সাধারণের প্রবৃত্তি নেই। এরূপ কাজ যিনি করতে পারেন তাঁকে পণ্ডিতের সম্মান ও বিশাল ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করা সমাজের কর্তব্য।

এর মধ্যে গবেষণা ও গবেষকের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে তাকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না।

সাল-তারিখের সঠিক তালিকা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান। আর গবেষণার সফলতা নির্দিষ্ট বিষয়ের বোধি-উজ্জ্বল আলোচনায়—যে আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় সৃষ্টির মূল্য। কাজেই বুদ্ধদেবের মত সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়।

বুদ্ধদেবের মতে আনন্দবিহীন কর্তব্য অনায়াসে করতে পারাতেই প্রোফেসরের মহিমা। পঠনপাঠন দ্বারা লব্ধ আনন্দ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। বাস্তব জগতে তিনি অসহায়। গ্রন্থকে জীবনভাষ্য বলে মনে করেন না বলেই প্রোফেসর থাকতে পারেন অবিচল। বই তাঁকে উজ্জীবিত করে না; জাগ্রত মনের দুঃখ থেকে তিনি মুক্ত। কল্পনা, চিন্তা—এসব মানসিক গুণ তাঁর নেই।

তাই জাগতিক সুখের অভাবে না থাকলেও তিনি অন্তরে অসহায়। শান্তিময়, স্বচ্ছন্দ, মসৃণ তাঁর জীবন। দরিদ্র হলেও চরিত্রবান সংসার সতত তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। পরের প্রাপ্য না দেওয়ার সাহস তাঁর নেই। অপরকে বঞ্চনা করার মতো তীক্ষ্ণ সাংসারিক বুদ্ধির অধিকারী তিনি নন। চরিত্রহীন হওয়ার মতো সাহসের অভাবেই তিনি চরিত্রবান। তাই বিষয়ী তাঁকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে প্রতিবেশী। তার উপরে আছে পরীক্ষার্থীর উদ্দেশ্যনিবিড় চাটুবাদ। আপন জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয়।

কর্মক্ষেত্রেও তিনি সুখী। বিদ্যাদানকে তিনি আনন্দের সঙ্গে অন্বিত করেন না। তরুণ ছাত্রের প্রাণোৎসাহ তাঁর শিক্ষাগুণে হয় অন্তর্হিত। পাঠকে প্রাণবিচ্ছিন্ন করার দুঃসহ সাধনায় তিনি সিদ্ধ। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নেই তাঁর অন্তরের যোগ। তাঁর বোঝা এবং বোঝানোয় অনুভবের স্পর্শ মাত্র নেই। কাব্যকে নীরস করে তোলা, সরল বিষয়কে জটিল করা এবং জটিল বিষয়কে জটিলতর করে তোলার কাজে তিনি কৃতী। বহু বর্ষের ক্লান্তিহীন সাধনায় তিনি জগৎ ও জীবনের সব কিছুকেই করে তুলেছেন যান্ত্রিক। নিত্য নতুন মানসিক প্রক্রিয়ার সংঘাত বা সমস্যা সমাধানের মতো কর্ম তিনি করেন না। তাই তাঁর আলোচ্য সাম্প্রতিক সাহিত্য নয়; বহু চর্চিত প্রাচীন সাহিত্যই তাঁর স্বক্ষেত্র।

তাঁর প্রণীত গ্রন্থ পাঠককে করে তোলে সাহিত্য সম্পর্কে অনুৎসাহী। প্রাণের স্বতোৎসারিত আনন্দ তাঁর কাছে উপেক্ষার বিষয়। তিনি বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বিষয়কে রসহীন, প্রাণহীন তথ্য-তালিকায় রূপান্তরিত করাই বিদ্যার কাজ। এরূপ কঠিন কর্মে সফলতা হেতুই তিনি সম্মানীয়।

এ প্রবন্ধের মূলে হয়তো আছে লেখকের কোনো ব্যক্তিগত তিক্ত স্মৃতি। আবার এ সত্যও মেনে নিতে হবে কেবল পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে যাঁরা পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন—তেমন পাণ্ডিত্যগর্বী অধ্যাপকও এদেশে কম নেই। প্রবন্ধটির উদ্দিষ্ট এরূপ প্রোফেসর যাঁদের নিয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'সমারূঢ়' নামের তিক্ত কবিতাটি।

১৯৩৯ সালে রচিত **'পড়া'** নামের হালকা চালের নিবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসু প্রকৃত পাঠকের বিশেষত্ব এবং বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে পাঠক তিন ধরনের। এক দল পাঠক নিজেদের বিদগ্ধতার প্রমাণ হিসেবে বই পড়েন; তাঁদের পাঠ্য নামী লেখকদের বই। দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠক সময় কাটানোর জন্য পড়েন হালকা বই। এই দু দলের কেউই প্রকৃত পাঠক নন। প্রকৃত পাঠক তাঁরা—যাঁরা কেবলমাত্র উপভোগের আনন্দ লাভের কারণে বই পড়েন।

প্রকৃত পাঠকও কিন্তু অনেক সময়ে পাঠ্য বই সম্পর্কে ভ্রান্তির শিকার হন। লেখক-খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা এমন বই পড়েন যা আনন্দদায়ক নয়। সাধারণত পাঠক তখন লেখকের শক্তিকে কটাক্ষ করেন না। তাঁর ধারণা হয় আপন বোধের দুর্বলতা হেতু তিনি গ্রন্থ-উপভোগে অক্ষম। বিখ্যাত গ্রন্থ মাত্রেই যে পাঠ্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ নয়—এ সত্য স্বীকারের সাহস বহু পাঠকেরই নেই। এজন্য যথার্থ পাঠক যাঁরা বইকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন তাঁদের সংখ্যা কম।

বুদ্ধদেব বসুর মতে গ্রন্থের বিস্তৃতিও পাঠের অন্তরায়। তিনি বলেন ছোটো গল্প বিশেষত কবিতার আকার ক্ষুদ্র বলেই তা পাঠককে আকর্ষণ করে। বিশেষত বার বার পাঠেই কবিতার মর্ম উদঘাটিত হয়। ভালো কবিতা প্রতি পাঠে হয়ে ওঠে নতুন। পাঠক সে পাঠে পায় তৃপ্তি।

কিন্তু উপন্যাসের উৎসাহী পাঠকও প্রিয় উপন্যাসের দ্বিতীয় পাঠে অনাগ্রহী। এর কারণ প্রথমত উপন্যাসের দীর্ঘতা; দ্বিতীয়ত উপন্যাস কাহিনিনির্ভর আর প্রথম পাঠেই কাহিনি-পরিণাম জানা যায়। ফলে পাঠক দ্বিতীয় পাঠের প্রয়োজন বোধ করে না। তাই উপন্যাসের অবয়ব দীর্ঘ না হওয়াই ভালো এবং কাহিনি আকর্ষক হওয়া কাম্য। এরপর বুদ্ধদেব বসু আপন মতের সমর্থনে কিছু প্রমাণ দিয়েছেন।

উনিশ শতকের অধিকাংশ ইংরেজি উপন্যাসের আকার বড়ো; এবং প্রস্তাবনা অংশ রসহীন। অনেক পাঠকের উৎসাহ এ অংশেই নষ্ট হয়ে যায়; আসল গল্পের পৌঁছোনোর উৎসাহ তাঁদের থাকে না। ফরাসি উপন্যাস তুলনায় সুপাঠ্য। কারণ তার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অবয়ব, বাহুল্যহীন বর্ণনা এবং আকর্ষক সূচনা। আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের আকার ফরাসি উপন্যাসের প্রভাবে হয়েছে পরিবর্তিত।

কাহিনির আকর্ষক উপস্থাপনা পাঠকমনকে উপন্যাস পাঠে উৎসাহী করে। চার্লস ডিকেন্স (Charles John Huffam Dickens : ১৮১২-১৮৭০) আর টমাস হার্ডির (Thomas Hardy : ১৮৪০-১৯২৮) উপন্যাসে আছে এই আকর্ষক ভঙ্গি। আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France : ১৮৪৪-১৯২৪)-এর উপন্যাসের গতি ধীর হলেও কাহিনি-অভিমুখী। লেভ টলস্টয় (Lev Nikolevich Tolstoi : ১৮২৮-১৯১০)-এর দীর্ঘ উপন্যাসেও আছে গল্পের দুর্বার টান। ফলে পাঠক এঁদের উপন্যাস পড়ে উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু অনেক বিখ্যাত উপন্যাসই অনাকর্ষক। যেহেতু পাঠকের উপভোগ্যতায় গ্রন্থের সার্থকতা; সে হেতু এসব গ্রন্থকে মহৎ বলা যায় না। আবার পাঠকের যোগ্যতা, রুচি ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে তাঁর প্রিয় লেখক নির্বাচন। তাই গ্রন্থের আকর্ষণ গুণও ব্যক্তিভেদে হয় ভিন্ন। সে কারণে গ্রন্থের আকর্ষক গুণহীনতা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া সম্ভব। তথাপি এটি প্রমাণিত সত্য যে মহৎ লেখক অধিকাংশ পাঠকের মনকে টেনে রাখতে পারেন। কিন্তু ব্যতিক্রমী লেখকও আছেন। এঁদের বই পাঠককে পড়তে হয় কষ্ট করে। উদাহরণ হিসেবে বুদ্ধদেব মার্শাল প্রুস্ত (Marcel Proust : ১৮৭১-১৯২২)-এর নাম করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে তাঁর রচনা। কিন্তু পাঠক বুদ্ধদেবের মতে প্রুস্ত-এর রচনা দুষ্পাঠ্য।

প্রবন্ধের শেষে বুদ্ধদেব দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন আপন মত। তাঁর মতে বই পড়ার প্রধান ও প্রথম শর্ত ভালো লাগা। যে বই উপভোগ করা যায় না তা থেকে প্রাপ্তির মাত্রা শূন্য। আবার লেখার কৌশল শেখার জন্য চাই আনন্দদায়ক গ্রন্থ।

প্রথম যৌবনের আনন্দে তিনি একদা সব বই-ই পড়তেন সমান ভালো লাগা নিয়ে। আজ তা নেই। তাই তিনি ভালো না লাগা বই অসমাপ্ত রাখতে দ্বিধা করেন না। তরুণ বয়সে তাঁর ধারণা ছিল বই শেষ না করা সৌজন্যহীন আর নীতিগর্হিত কাজ।

কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি, সুলভতা আর পাশ্চাত্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থসংখ্যা আর বিষয়—দুটিই গেছে বেড়ে। ফলে নির্বাচন ভিন্ন সাধারণ পাঠকের পক্ষে বই পড়া অসম্ভব। কাজেই তাকে নির্বাচন করতেই হয়।

বইপড়া উচিত কিনা এ প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন দেখা যায় অবিরাম গ্রন্থপাঠে বিপর্যস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক বুদ্ধি; কোনো কোনো মানুষ হয়ে যাচ্ছেন বাস্তব বিস্তৃতির শিকার। অধিক গ্রন্থপাঠের পক্ষে যাঁরা বলেন তাঁরা পড়েন প্রচুর বই। কিন্তু অন্যকে বইয়ের নাম বলে বিস্মিত করা ভিন্ন গ্রন্থ থেকে তিনি আর কিছুই পান না।

বই পড়া ভালো। কারণ বই আনন্দ দেয় এবং সুন্দর করে বাঁচতে শেখায়। সুন্দর করে ভালো করে বাঁচাই জীবনের উদ্দেশ্য। বই এর একটি উপায়মাত্র। কাজেই মানুষের উচিত আপন প্রয়োজনমতো বইপড়া। তা না হলে উপায় বড়ো হয়ে ছাপিয়ে যাবে উদ্দেশ্য—যা কোনো ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

১৯৩৭-এ লেখা **'কথা ও কথক'** নিবন্ধের বিষয় কথা বলার শিল্পকৌশল। বুদ্ধদেব বসুর মতে কথা বলা একটি শিল্প। সে শিল্পে সকলে দক্ষ নন। কেউ কেউ এ শিল্পে পারদর্শী। দ্রুত তাঁরা দিতে পারেন কথার উজ্জ্বল উত্তর। তুচ্ছ ঘটনা তাঁদের বর্ণনার গুণে আকর্ষণ করে শ্রোতার মন। তাঁদের কথায় থাকে অতিরঞ্জন; কিন্তু তা কথাকে করে তোলে সুন্দর।

যাঁদের কথা বলায় নিপুণতা নেই তাঁরা আড্ডা জমাতে পারেন না। মজার ব্যাপার তাঁদের কণ্ঠে হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর। কথার খোঁচায় বিদ্ধ হলেও তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিশানিত উত্তর দানে তাঁরা অক্ষম।

কিন্তু উত্তম বক্তা আর প্রকৃত রসিক মানুষ মাঝে মাঝে প্রশংসার আধিক্যে হারিয়ে ফেলেন বাস্তব জ্ঞান। তখনই আসে বিপদ। তুচ্ছ কথাকে মোচড় দিয়ে কৌতুককর করার ক্লান্তিকর চেষ্টায় তিনি বিফল হন। তাঁর মজার গল্পের পুনরাবৃত্তি শ্রোতাদের শ্রান্ত করে। খ্যাতি রক্ষার চেষ্টায় খ্যাতির উৎস যায় শুকিয়ে।

আবার এমনও দেখা গেছে বচনপটু রসিক বক্তা অনেক সময় শ্রোতার অরসজ্ঞতার শিকার হন। তাঁর সাধারণ কথাকেও রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তিনি তাতে অপ্রস্তুত হন না।

কথনশিল্পের সফলতা তাই কেবল কথকের উপর নির্ভর করে না—শ্রোতার উপরেও তা নির্ভরশীল। বুদ্ধিমান, সচেতন, রসগ্রহণে সক্ষম শ্রোতাই রসস্রষ্টা কথকের স্রষ্টা। এঁদের সংখ্যা সব দেশেই খুব কম। এজন্যই রসিক কথকের সংখ্যাও কোনো কালেই খুব বেশি হয় না।

'মতান্তর ও মনান্তর' ১৯৪০ সালে রচিত লঘু ভঙ্গির গুরু প্রবন্ধ। তর্ক আলোচনার প্রভেদ ও দোষগুণ বিশ্লেষিত হয়েছে এই শিথিল গঠনের প্রবন্ধটিতে। তর্ক আর আলোচনা এক নয়। তর্ক স্নায়ুকে উৎপীড়িত করে; আলোচনা করে উজ্জীবিত। প্রসঙ্গত এসেছে তর্ক যাঁদের প্রিয় নয় এমন কিছু ব্যক্তির প্রসঙ্গ। দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তি তর্ক পছন্দ করেন না। কারণ তর্কে আহত হয় তাঁদের বিশ্বাস। এর মধ্য দিয়ে কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। বিরোধিতাকে তর্কের মাধ্যমে চূর্ণ করার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বাসের সত্যতা। সাধারণত ধর্মবিশ্বাসীগণই হন এরূপ তর্কবিমুখ।

আপন বিরোধিতা সহ্য করতে পারেন না অহংকারী ব্যক্তিগণ। তাঁরাও তর্কের পক্ষপাতী নন। সফল ব্যবসায়ী, পণ্ডিত প্রোফেসর আর আত্মসচেতন শিল্পীদের মধ্যে প্রায়শ এরূপ ব্যক্তির দেখা মেলে।

বুদ্ধদেব বসুর মতে দুজন মানুষ কোনো সময়েই সব বিষয়ে একমত হতে পারেন না। এই অমিলই মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলে মানুষের সঙ্গ। সব কথার সায়যুক্ত উত্তর মনে আনে অবসাদ। প্রতিটি ব্যক্তিমনের স্বাতন্ত্র্য আলাপকে করে তোলে আনন্দময়। সেই আলাপে উদঘাটিত হয় বিষয়ের নতুন নতুন দিক।

তর্ক বুদ্ধদেব বসুর পছন্দ নয়। কারণ তর্ক প্রায়শ হয়ে ওঠে কুতর্ক। দু জনে পুরোপুরি বিপরীত দৃষ্টিতে কথা বলে; একে অন্যকে টানতে চায় নিজের পক্ষে। তর্কের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুপক্ষেরই মেজাজ হয়ে ওঠে তপ্ত; সমাপ্তিতে উভয়ের মনেই আসে অবসাদ। আলাপ-আলোচনার সঞ্জীবনী প্রভাব তর্কে অনুপস্থিত।

আলাপ-আলোচনা দেহ ও মন—দুটিকেই সঞ্জীবিত করে এটাই বুদ্ধদেব বসুর মত। কারণ বহু ব্যক্তি একই বিষয়ে আলোচনা করলেও সকলে একই মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন না। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তার বাঙ্ময় প্রকাশ বিষয়টির বিকাশের সহায়ক হয়; আলোচকদের মনও হয় সমৃদ্ধ। এজন্যই বন্ধুত্ব হয় সম মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে। মূল্যবোধের ঐক্য যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে একই বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয় আলাপ। এবং পরিণতিতে মতান্তর

থেকে সৃষ্টি হয় মনান্তর। বুদ্ধদেবের মতে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করা উচিত নয়। কারণ উভয়েই স্ব স্ব মতবাদে অটল থাকায় নির্মল অবসর শীঘ্রই হয়ে ওঠে আবিল। এক্ষেত্রে প্রয়োজন বিষয় পরিবর্তন। কিন্তু তেমন আত্মসংযম কম লোকেরই থাকে। আপন মতকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারে কম লোক। ফলে মতান্তর আর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

আলোচনা কেমন হওয়া উচিত—এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু দিয়েছেন তাঁর এক দার্শনিক বন্ধুর উদাহরণ। তিনি কোনো বিষয় উপস্থাপন করে সমবেত সকলের মতামত শোনেন। পরিশেষে এমন ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত পেশ করেন যে কারও কিছু বলার থাকে না। তাঁর আলাপ শোভন এবং চিন্তাশীল। তাঁর কথায় পুনরাবৃত্তি থাকে না। আর আপাত মীমাংসার পরই তিনি প্রসঙ্গ পালটে দেন। ফলে আলোচনা তথা আলাপ হয় বিচিত্র এবং গতিশীল। উপস্থিত সকলেই কিছু না কিছু বলার সুযোগ পায় এবং সময়ের হয় সুব্যবহার।

তাহলে বিপরীত মতের ব্যক্তির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত? স্বভাবত মনে আসে এ প্রশ্ন। তাদের এড়িয়ে চলার অর্থ পলাতক মনোবৃত্তির প্রশ্রয়দান।

বিপক্ষকে নিজের মতে আনার চেষ্টাও করা যায়। কিন্তু বিপক্ষও আপন মত প্রচারের প্রাণপণ প্রয়াস করে। ফলে প্রশ্নে, উত্তরে, প্রতি উত্তরে সৃষ্টি হয় অন্তহীন জটিল বিতর্ক। কালক্ষয়ের কোনো উপযুক্ত ফলও পাওয়া যায় না।

দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক অনৈক্য থাকলে বিরোধিতা দরকার। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বিরোধিতা এড়িয়ে চলাই শালীনতা রক্ষার একমাত্র পথ। মতান্তর যখন সমাজজীবনে ব্যাপ্ত হয় তখন তা আত্মপ্রকাশ করে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ হিসেবে। পরিশেষে গড়ে ওঠে নতুন সমাজ।

ব্যক্তিগত ছোটো ছোটো মতভেদের পশ্চাতে জীবন্ত বিশ্বাস থাকলে এভাবেই তা হয়ে উঠতে পারে সমাজবিধ্বংসী শক্তি। মতান্তর থেকে মনান্তর হওয়া স্বাভাবিক সত্য। জীবন্ত জাতির বিদ্বেষ আর প্রীতি উভয়ই হয় প্রবল। মতান্তরে তার প্রকাশ লক্ষিত হয়। জাতীয় প্রাণশক্তি দুর্বল বলেই আমাদের বিদ্বেষ আর প্রীতি—কোনোটাই তেমন শক্তিশালী হয় না।

সমাপ্তিতে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন খাওয়া-পরা আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ে রুচিবৈষম্য বন্ধুত্বের অন্তরায় নয়। মৌল বিষয়ে মতভেদই বন্ধুত্বের বিনাশ ঘটায়। দুটি মানুষের সম্বন্ধ যদি হয় মাতা-পুত্র-স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘনিষ্ঠ এবং সেখানে একের জীবনসাধনা অন্যের উপহাসের বিষয়; একের বিশ্বাসহীনতা অন্য জনের জীবনসম্বল—সেখানে মিলন সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক হতে পারে না হৃদয় অনুভূতি-আর্দ্র মানবিক সম্বন্ধ। উভয়ে উভয়কে সহ্য করে যায়—এই মাত্র।

বহির্জীবনে এরূপ ভিন্নতা থেকে আসে মতান্তর। যে মতে ব্যক্তি অস্তিত্ব বিপন্ন হয় অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার সকল উপাদানকে অস্বীকার করে যে মত—তার সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মনান্তর স্বাভাবিক এবং সংগত। ১৯৪০-এ রচিত প্রবন্ধটিতে সমকালীন রাজনীতির দোলাচলতার ঈষৎ আভাস লক্ষিত হয়।

১৯৩৯ সালে রচিত **'মাত্রাজ্ঞান ও অতিরঞ্জন'** নিবন্ধে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন বাঙালির স্বভাবে আছে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা তথা বাড়াবাড়ি। যে কোনো অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আধ ঘণ্টা-পনেরো মিনিট জাতীয় সংগীত গাওয়া ও সে সময় দাঁড়িয়ে থাকা তার একটি উদাহরণ। বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকলেই যে জাতীয় সংগীতের প্রতি তথা স্বদেশের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হয় তা নয়। কারণ জাতীয় সংগীত দেশ নয়; দেশপ্রেমের একটি প্রতীক। সময়ের ওজনে তার দাম বাড়ে না। যেহেতু জাতীয় সংগীত প্রতীক—তার জন্য বেশি সময় ব্যয় অর্থহীন। সংক্ষিপ্তভাবে সুরটি বাজালেই যথেষ্ট। কারণ মানুষের সময় কম; কাজ অনেক।

শুধু জাতীয় সংগীতের ক্ষেত্রেই নয়—বাঙালির প্রায় সব অনুষ্ঠানে আর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দেখা যায় এই অতিরেক। উদাহরণ হিসেবে বুদ্ধদেব বসু বাংলা সিনেমার কথা বলেছেন। ইঙ্গিতের উপর বাংলা চলচ্চিত্র-পরিচালকের বিশ্বাস নেই—আস্থা নেই দর্শকের বোধের উপর। অতিরঞ্জিতভাবে সব কিছু প্রদর্শনই বাংলা ছবির বিশেষত্ব। সেজন্য বাস্তবতা লঙ্ঘনেও তার আপত্তি নেই। তাই প্রোফেসরের বাড়ির চায়ের পার্টি হয় আড়ম্বরবহুল, ধর্মঘটের দৃশ্যে থাকে না উত্তেজনা।

শিল্পে অতিরেক অসংগত নয়। বিশেষত কৌতুকের ভিত্তি অতিরঞ্জন। মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র-দুর্বলতার অতিরঞ্জিত উপস্থাপনেই সৃষ্টি হয় কৌতুক। অন্য ধরনের ছবিতেও অতিরঞ্জন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝাতে পারেন মাত্রাজ্ঞান-সম্পন্ন পরিচালক। চ্যাপলিন-এর ছবিতে ক্ষুধার তীব্রতা বোঝাতে বন্ধুর বিশাল কুক্কুট রূপ গ্রহণ তার একটি দৃষ্টান্ত। পরিচালকের রসবোধ কাজ করছে বলেই সার্থক এই অতিরেক। বাংলা ছবিতে অতিরঞ্জনের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। বাংলা ছবির নির্মাতারা বোধ হয় ভাবেন পরিমাণের আধিক্যের উপর উৎকর্ষের মাত্রা নির্ভর করে। তাই নাচ, গান, কলকাতার পার্টি, গ্রাম্য উৎসব, ধর্মঘট, প্রেম, স্বদেশ—সব কিছুর সামঞ্জস্যহীন সমাহার বাংলা ছবিকে করে তোলে অবাস্তব এবং শিল্পগুণহীন।

শুধু শিল্পে বা সভা-সমিতিতে নয়; বাঙালির সমাজজীবনেও লক্ষিত হয় মাত্রাজ্ঞানহীন অতিরেক। তাদের সামাজিক উৎসবে আমন্ত্রিতের সংখ্যায় থাকে না নিয়ন্ত্রণ; ভোজ্য দ্রব্যের আয়োজনে দেখা যায় অপচয়। বক্তার বক্তৃতায় দেখা যায় উচ্ছ্বাস; অভিনয়ে লক্ষিত হয় কৃত্রিমতা। অর্থাৎ বাস্তব-বিচ্ছিন্নতাকেই বাঙালি উৎকর্ষের শর্ত বলে মনে করে।

বাঙালির এই মাত্রাজ্ঞানহীনতা তথা বাহুল্যপ্রিয়তা প্রভাবিত করে তার বিজ্ঞাপনকে। অথচ সংক্ষিপ্ত, ইঙ্গিতসমৃদ্ধ প্রকাশই বিজ্ঞাপনের সাফল্যের শর্ত। বাঙালি-মনে বিজ্ঞাপনের এই শিল্পশর্ত সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা লক্ষিত হয় না। বিশেষণ-সমৃদ্ধ উপস্থাপনার সঙ্গে বিখ্যাত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র সংযোজনকেই বাঙালি ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের চরম প্রকাশ বলে মনে করেন। বাঙালির বইয়ের বিজ্ঞাপনেও একই ব্যাপার দেখা যায়। কারণহীন বিশেষণ-বাহুল্য আর বিখ্যাত বিদেশি লেখকদের তুলনা দেওয়াতেই গ্রন্থ বিজ্ঞাপন সীমাবদ্ধ।

এই অতিরঞ্জন-প্রবণতার জন্যই বাংলায় সার্থক গ্রন্থ-সমালোচনার এত অভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচনা হয় নিছক প্রশংসা অথবা বিশুদ্ধ নিন্দা। প্রশংসাত্মক সমালোচনা প্রায়শ সংযমের অভাবে বইয়ের বিজ্ঞাপন হিসেবে হয় ব্যর্থ। নিন্দামূলক সমালোচনা অবশ্য বইয়ের ক্ষতি করে। কারণ নিন্দা সহজেই বিশ্বাস্য হয়। অন্যের নিন্দা আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গোপন তৃপ্তির অনুভব জাগায় বলেই এরূপ সমালোচনা বইয়ের ক্ষতিই করে।

বাঙালি চায় নির্দিষ্ট একটি আদর্শের রূপ হিসেবে লেখককে গ্রহণ করতে। তাই নতুন লেখক তার মনোজগতে প্রবেশাধিকার পায় না। ব্যক্তিগতভাবে লেখক অনেক সময় স্তুত হন। কিন্তু সে স্তুতি, সে প্রশংসা যেমন বন্যার মতো আসে তেমন দ্রুত ধ্বংসও হয়। এরও কারণ বাঙালি মনের অতিরেকপ্রবণতা ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব—যা তার চরিত্রের বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'এ-যুগের কবিতা' নিবন্ধটির রচনাকাল ১৯৩৯। এ নিবন্ধে আধুনিক কবিতার বিষয়ের যে যুগোচিত পরিবর্তন হয়নি—এই দিকটি আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধদেব যন্ত্রের ধ্বনি ও দৃশ্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণের পথে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে।

কিটস্ (John Keats : ১৭৯৫-১৮২১) বলেছিলেন পতঙ্গের গুঞ্জনেও আছে কাব্যস্পন্দন। বুদ্ধদেব আপন অনুভব-লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যন্ত্রের ছন্দিত শব্দেও আছে মধুরতা—যা অনায়াসে হতে পারে কবিতার বিষয়।

লেখক প্রথমে যন্ত্রধ্বনির মাধুর্যের দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে দূর থেকে শোনা ট্রেনের শব্দের আছে অপরূপ একটি মাধুর্য। আবার দূর পাল্লার ট্রেনের যাত্রীর কানেও ট্রেনের চাকার ঝংকৃত শব্দ সৃষ্টি করে আশ্চর্য এক আবেশ। এই আবেশ হতে পারে কবিতার জন্ম-উৎস। তা যে হয় না তার কারণ যন্ত্র এখনও আমাদের অনুভব-গভীরতার সেই স্থানে পৌঁছোতে পারেনি যেখান থেকে উঠে আসে কবিতা।

ইলেকট্রিক ডায়নামোর নিয়মিত স্পন্দনও রাতের অন্ধকারে হয়ে ওঠে কাব্যময়। বুদ্ধদেবের মতে সব ধরনের যন্ত্রের গতিজাত ধ্বনিই একটি স্পষ্ট ছন্দে বাঁধা। সেই ছন্দস্পন্দ আমাদের মনকে আলোড়িত করে। এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্টিমার-এর গম্ভভীর, উদার, রহস্যময় দূরশ্রুত ভোঁ। রেলের বাঁশির চপলতা সে ধ্বনিতে নেই। কারখানার বাঁশির হুকুমের ভঙ্গিও অনুপস্থিত স্টিমার-এর বাঁশিতে। তাই তার ধ্বনিরূপ মনকে করে দেয় ঘরছাড়া।

নিবন্ধের পরের অংশে বুদ্ধদেব বলেছেন যন্ত্রের দৃশ্যসৌন্দর্যের কথা। যন্ত্র বদলে দিয়েছে প্রকৃতির দৃশ্যরূপ। তার ফল যে সব সময়ে খারাপ হয়েছে এমন নয়। কারখানার চিমনি গঙ্গার উভয় তীরের সৌন্দর্য ধ্বংস করেছে। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে ভাসমান জাহাজের বলিষ্ঠ সৌন্দর্য অস্বীকার করা যায় কি? তেমনই রাত্রির গঙ্গার আলোকস্পন্দিত কালো জলের সৌন্দর্যও অস্বীকার করা যায় না।

বিরাট রেলের ইঞ্জিনের যে একটি পুরুষালি রূপ আছে সে বিষয়েও পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন লেখক। ইঞ্জিনটি নির্মাণের সময় সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়নি—নজর রাখা হয়েছে তার উচ্চতম কার্যকারিতার দিকে। তথাপি অস্বীকার করা যায় না তার উপমাহীন রূপ। বিশাল কারখানার মহিমান্বিত রূপকেও অস্বীকার করা সহজ নয়। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি কবিতার বিষয়।

নিবন্ধের শেষ অংশে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য বর্তমান মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে যন্ত্র। কিন্তু কবিতাকে পালটাতে পারেনি সে। তাই কবিতার উপজীব্য এখনও যন্ত্রসৌন্দর্য নয়; প্রকৃতির রূপ। এই প্রকৃতি-নিবিড়তার কারণ হয়তো মানুষের কৃষিনির্ভর আদিম জীবন। সে জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা ছিল ব্যাপক। মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ই স্থান পায় সাহিত্যে তথা কবিতায়। তাই কবিতায় প্রকৃতির ঋতুরূপ আর মেঘ-বৃষ্টি-রোদের ছিল বড়ো স্থান।

আধুনিক মানুষের জীবনে যন্ত্র এনেছে বিপ্লব; আজ সে প্রকৃতি-নির্ভরতা থেকে অনেকটা মুক্ত। কিন্তু কবিতায় তথা সাহিত্যে এই যন্ত্রবিপ্লবের প্রভাব আজও অনুপস্থিত। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ বিবর্তনের।

তাই আধুনিক কবিতা যথেষ্ট আধুনিক নয়। যন্ত্রযুগে তার অবস্থান, কিন্তু কৃষিযুগ নিয়ে তার কাজ। হয়তো একদিন যন্ত্রকে মানুষ দেখতে পাবে সেই আবেগের চোখে—যে চোখে ধরা পড়ে বর্ষার কালো মেঘের রূপ। কবিতা তখনই হয়ে উঠবে যন্ত্রযুগের যথার্থ কবিতা। তার আগে কবিতায় যন্ত্রের উল্লেখ থাকবে; হয়তো দেখা যাবে এ উল্লেখের প্রাচুর্য। কিন্তু তা নিয়ে বিচলিত বা অহংকৃত হওয়া অর্থহীন। কারণ বিষয় নয় কাব্যিক গুণ দিয়েই কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়।

১৯৪০-এ লেখা **'মহুয়ার দেশে'** অনুভবসমৃদ্ধ স্নিগ্ধ একটি ভ্রমণকথা। অখ্যাত এক স্থানে শীতশেষে সপরিবার বেড়াতে গিয়েছিলেন লেখক। তাঁদের আশ্রয়স্থল ছিল বড়ো একটি বাংলো। সে বাংলোর অঙ্গন ছিল বিশাল। বড়ো বড়ো গাছ ছিল তার অঙ্গনে আর ছিল হাঁস-মুরগি, পায়রা, গিনি ফাউল, গোরু—এইসব পোষ্য প্রাণী। কাক আর বেড়াল ছিল না—যা স্থানটির বিশেষ গুণ বলে মনে হয়েছিল লেখকের। অবশ্য স্থানটিতে অতীতে বেশ কয়েকটি সাপ দেখা গিয়েছিল। লেখকের অবস্থান কালেও মারা হয়েছিল একটি নবীন চিতি সাপ।

স্থানটির বিশেষত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। তাঁর মতে খ্যাতিহীনতাই এই স্থানটির বৈশিষ্ট্য। এখানে ছিল

না কোনো সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান। তুষার বা সমুদ্রের রূপের ব্যাপ্ত মহৎ বিশালতা মানুষকে মুগ্ধ করে। সেই সৌন্দর্যের কণামাত্র উপভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় মন থাকে উদ্বিগ্ন। পাহাড়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই ব্যাপার। দর্শন ও ভ্রমণের স্থান এত অধিক থাকে যে সবটা উপভোগ করা যায় না। ফেরার আগে মনে জেগে থাকে না দেখার অনুতাপ।

অখ্যাত এই স্থানটিতে সৌন্দর্যপ্রসিদ্ধ স্থানের অভাবে নেই বেড়াতে যাবার গোলমাল। সমতল এই স্থানটি সাধারণ বলেই সুন্দর। কাছাকাছি নেই কোনো দর্শনীয় পাহাড় বা ঝর্না। দক্ষিণে পরেশনাথ পাহাড় আর পশ্চিমে খন্ডৌলি পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা দেখার জন্য ডাকাডাকি করে না। রেল-স্টেশন, মুদি-দোকানের মতো স্বাভাবিকভাবে এখানে আছে শালের সারি, মহুয়ার বন, মাঠ আর নিড়োনো খেত। আর আছে রেল কোম্পানির বিশাল পুকুর। স্নান আর কাপড়কাচা নিষেধের নোটিস সত্ত্বেও সেটি হয়ে উঠেছিল সারা গ্রামের স্নানাগার আর রজকালয়। অগাধ নীল আকাশের নীচে চঞ্চল-উজ্জ্বল বাতাস মেখে এখানে একদিন স্নান করেছিলেন লেখক।

তিনি উপভোগ করেছিলেন এই গেরুয়া প্রান্তরের নিজস্বতায় মন্ডিত দুপুর। কাজ আর অবসরের চাপে কলকাতায় দুপুরের নিজস্ব রূপ মুছে গেছে। এখানে তিনি দুপুরের ঈষৎ মদির স্বাদ অনেকটা সময় নিয়ে উপভোগ করেন। প্রিয় কবির নতুন বইয়ের মতো, বিচিত্র কবিতাগুচ্ছের মতো এখানে দুপুরগুলি এক একটি সুরে বাঁধা। কোনো দিন হালকা মেঘ করে। জোরালো হাওয়ায় শুকনো পাতা-ঝরা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা দেখেন মহুয়ার ফুল, আমের বোল আর হঠাৎ-আসা পাখির রূপ। কোনো দিন যাওয়া হয় বাড়ির বাইরে। উপভোগ করা হয় বিস্তৃত প্রান্তরের নির্জন রূপ। কোনো দিন নির্মল নীল আকাশের নীচে চড়া রোদে বসা হয় উত্তরের চওড়া ঠাণ্ডা বারান্দায়। মেয়েরা বাজান গ্রামোফোন, লেখক করে নিজের কাজ। তারপর ক্রমে দুপুর ঢলে পড়ে বিকেলের কোলে। এমন দীর্ঘ মধুর দুপুর তিনি অন্য কোনো স্থানে পাননি। সময় এখানে অনেক আর সময় কাটানোর উপকরণও প্রচুর।

সন্ধ্যায় এখানে থেমে যায় জীবন। আকাশে কখনও দেখা যায় একা চাঁদ; কখনও অন্ধকার বিদীর্ণ করে তীক্ষ্ণ দ্যুতি তারার দল। জ্যোৎস্নার পরিবর্তে ঘন বোনা কাপড়ের মতো গাঢ় অন্ধকারের ধীর আগমন তাঁদের মুগ্ধ করে। কারণ অন্ধকারের এমন জমাট গাঢ় রূপ দেখতে তাঁর অভ্যস্ত নন। তারা-ভরা আকাশ, জোনাকি-জ্বলা গাছের মাথা তাঁদের মুগ্ধ করে।

স্থানটির একটি বিশেষত্ব কোথাও বের হতে হয় না আর বের হতে ইচ্ছা হলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না সাজগোজ। বের হবার আগে ভদ্র বেশ ধারণ না করার স্বাধীনতা দুর্লভ এবং উপভোগ্য। কারণ সাধারণত বেড়াতে গিয়েও মানুষকে পোশাকের দাসত্ব করতে হয়। বিখ্যাত স্থানগুলিতে মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বের হওয়া যায় না। তোড়জোড় আর মাজাঘষার প্রয়োজন নেই বলেই এখানে ভ্রমণ আরামদায়ক। পুরোপুরি আটপৌরে হবার স্বস্তি শরীরকে দেয় বিশ্রাম—মনকে দেয় শান্তি। এখানে পাওয়া যায় সামাজিকতার বাঁধনহীন স্বস্তি। প্রকৃতির মধ্যেও এখানে আছে আটপৌরে ঘরোয়াভাব। তাই তার সঙ্গে বলা যায় মনের কথা। প্রকৃতি যেখানে সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত সেখানে সে মানুষের মুগ্ধ হৃদয় নিঃশেষে কেড়ে নিয়ে আরও কিছু দাবি করে। আর এই গেরুয়া মাটির প্রান্তর আর দূর পাহাড়ের রেখা আগন্তুকের কাছে কোনো দাবি করে না। চার পাশের নির্জনতা, অবসরের প্রাচুর্য প্রকৃতির অনাড়ম্বরতা এখানে মনের মধ্যে বোনা হয়ে যায়। কিন্তু মনকে তা ভারগ্রস্ত করে না। এখানেই 'মহুয়ার দেশে'র আসল সৌন্দর্য।

১৯৩৯ সালে লেখা '**ডাকঘর**' নিতান্ত ব্যক্তিঅনুভব-সমৃদ্ধ রচনা। বুদ্ধদেব বসু এই নিবন্ধে ডাকঘরকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন। নিতান্ত বালকবয়সে মফস্‌সল শহরের শান্ত-মন্থর জীবনে তিনি ডাকঘরকে দেখেছিলেন গতিময়, বর্ণোজ্জ্বল জীবনধারার বাহক রূপে। বস্তুত ডাকঘর বহির্জগতের ব্যাপ্ত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ব্যক্তিমানবের সংযোগ রক্ষা করে।

ডাকঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ বালক বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন সত্তাস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। তাঁকে চিঠি লিখতেন অনেক স্বজন; তাঁর নামে আসত নানা পত্রপত্রিকা আর বই। এসব কিছু পাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি অনুভব করতেন আপন অস্তিত্বের মূল্য।

একটু বড়ো হয়ে লিখতে শুরু করলেন বুদ্ধদেব। সেই সব লেখা ছাপার উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্যও ডাকঘরের দরকার। আর সেই উৎকণ্ঠ আগ্রহের ব্যর্থ অবসানের ক্ষেত্রটিও ছিল ডাকঘর।

প্রাপ্তবয়স্কের মনেও রয়ে যায় বাল্যবিস্ময়ের অবশেষ। তাই বয়স্ক বুদ্ধদেবের মনেও ডাকঘর সম্পর্কে থেকে গেছে অজানা এক আকর্ষণ। তবে সে ডাকঘর শহরের ব্যস্ত, ভিড়াক্রান্ত বড়ো ডাকঘর নয়। নির্জন মফস্‌সলের ছোটো সুন্দর ডাকঘরই তাঁর প্রিয়। তাই দার্জিলিঙে ম্যাল-এ যাবার পথের ডাকঘর তাঁর ভালো লেগেছিল। ডাকঘরের উপরতলায় বাস ছিল পোস্টমাস্টারের। তাকে ভাগ্যবান ভেবেছিলেন তিনি। আবার জলাপাহাড়ের পথে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘামুখী দোতলা ডাকঘরটিও হরণ করেছিল তাঁর মন। এই ডাকঘরেরও দোতলায় বাস ছিল পোস্টমাস্টারের। কৈশোরের মুগ্ধতা ভিন্ন আর এক কারণে তাঁর বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল এই পোস্টমাস্টারের জীবন। কারণ এই ব্যক্তি বাস করছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের শান্ত ব্যাপ্তির মধ্যে। আবার বহমান চঞ্চল জীবনস্রোতের সঙ্গেও রয়েছে তার যোগ। তাই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা বুদ্ধদেব বসুর মনে একটি বিশেষ ছাপ রেখে গিয়েছিল সেই ডাকঘর আর পোস্টমাস্টার।

'স্পোর্টস-এর বিরুদ্ধে'—১৯৩৯ সালে লেখা হয়। এই নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক পৃথিবীর ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদ সম্পর্কে মত্ততার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান পৃথিবী বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে উদাসীন। এখন জনতার কাছে সমাদৃত খেলোয়াড়। কারণ খেলার মধ্যে পাওয়া যায় সাময়িক উত্তেজনার চরম রূপ। বুদ্ধদেব বসু নৈতিক কারণে যে কোনো ধরনের স্পোর্টস বা ক্রীড়ার বিরোধী। তাঁর মতে এর ফলে মানুষের কোনো শুভ হয়নি। মূলত বিত্তবানদের শারীরিক শ্রমের কারণে স্পোর্টস-এর উদ্ভব। আদিম শিকারজীবী মানুষ বা কৃষিনির্ভর মানুষের জীবনে স্পোর্টস ছিল না। কারণ তখন জীবিকার জন্য সব মানুষই শ্রম করতে বাধ্য ছিল। কৃষিযুগের পর যখন সমাজ বিত্তনির্ভর হল তখন সমাজে দেখা দিল ধনী ও দরিদ্রের ভিন্নতা। শ্রমহীন বিত্তবানদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আবশ্যক শ্রম এবং বিনোদনের কারণে বিবিধ রোমাঞ্চকর ক্রীড়ার উদ্ভব।

প্রথম দিকে শ্রমহীন জীবন যাপন করত মুষ্টিমেয় রাজা। তাদের জীবনে প্রধান স্থান ছিল যুদ্ধের। তাই তাদের বিনোদনের জন্য প্রাণঘাতী, রক্তাক্ত শারীরিক ক্রীড়ার উদ্ভব হয়েছিল। রোম-এ গ্ল্যাডিয়েটরদের খেলা তার প্রমাণ। বর্তমানে স্পেন-এর ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধের খেলায় রয়ে গেছে তার স্মৃতি।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে শ্রমভিত্তিক পেশার স্থান দখল করল বহু বিচিত্র শ্রমহীন কাজ। রাজা-জমিদারদের স্থানে দেখা দিল বণিক সম্প্রদায়। রক্তপাতপ্রধান খেলার স্থলে এল পরিমার্জিত নানা খেলা। পৃথকভাবে শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন যতই বাড়ল ততই স্পোর্টস হয়ে উঠল প্রয়োজনীয়। এটুকুই স্পোর্টস-এর গুণ। তা ছাড়া খেলার কোনো পৃথক গুণ নেই, খেলোয়াড়েরও নেই স্বতন্ত্র কোনো চারিত্রিক গুণ। ইংরেজিতে স্পোর্টসম্যান কথাটির অর্থ ভদ্রলোক; তার কারণ বিত্তবান ভদ্রশ্রেণির মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করত।

স্পোর্টস সম্বন্ধে লেখকের আপত্তি এ কারণে যে আধুনিক সভ্যতা খেলা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকে। খেলার দ্বারা যে মনোহর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য ও নিপুণতা লাভ করা যায় তার মূল্য তিনি স্বীকার করেন। যেমন সার্কাসে ট্রাপিজ-এর খেলা। খেলার সঙ্গে অর্থের যোগও লেখক পছন্দ করেননি। তাই তাঁর মতে বিশুদ্ধ ও মনুষ্যোচিত ক্রীড়ার চর্চা কেবলমাত্র গ্রিস দেশে লক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রিসের খেলা ছিল নানা রূপ শারীরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন—আর পুরস্কার ছিল অর্থ নয় লরেল পাতা। তাদের অলিম্পিক খেলায় ছিল সাহিত্য ও সংগীতেরও প্রতিযোগিতা।

নৈপুণ্য থাকলেও আধুনিক কোনো খেলা এমন নয় যে সব ছেড়ে তাকেই গ্রহণ করতে হবে। অথচ পাশ্চাত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হয়ে উঠেছি স্পোর্টস-পূজারী। পাশ্চাত্যের দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতে যুক্তিবুদ্ধির উৎকর্ষ অপেক্ষা ক্রীড়ায় উৎকর্ষকে বেশি মূল্য দেয়।

রাসেল না বললেও ইউরোপ-এর অবস্থা আলাদা নয়। অক্স ফোর্ড-কেম্ব্রিজ-এ ফার্স্ট হওয়া ছেলে সম্বন্ধে ইংরেজের ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু ক্রীড়ানিপুণ অক্স ফোর্ড ব্লু সারা ব্রিটেন-এর প্রশংসাপাত্র। অক্স ফোর্ড-কেম্ব্রিজ-এর নৌকাবাইচ, ঈটন-হ্যারো-র ক্রিকেট ম্যাচ ব্রিটিশ মাত্রেরই উৎসাহের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয়তম অধ্যাপক অপেক্ষা বাচখেলায় জয়ী ক্যাপ্টেন সাধারণের অধিক শ্রদ্ধার পাত্র।

সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের যে সব কর্মী সভ্যতার গতিশীলতা বজায় রাখেন তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোনো উৎসাহ নেই। অথচ ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের নাম জানে সারা পৃথিবী। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায় অশিষ্ট, বিদ্যাচর্চায় অসফল ছাত্র ফুটবল-দক্ষতার কারণে বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার পাত্র। লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরির জন্য অর্থ সংস্থান হয় না যে সব বিদ্যালয়ে সেখানে স্পোর্টস-এর জন্য অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা দেখা যায় না। বিদ্যালয়ে শুধু নয় সারা দেশেই দেখা যায় বিদ্যা ও বুদ্ধির চর্চার অপেক্ষা স্পোর্টস-এর সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক মূল্য অধিক—যা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এভাবেই যুক্তি ও উদাহরণসহ স্পোর্টস নিয়ে মাতামাতির বিরোধিতা করেছেন বুদ্ধদেব বসু এ নিবন্ধে।

১৯৩৮-এ লেখা **'মেক-আপ-এর বিপক্ষে'**-একান্ত ব্যক্তিমনের চিন্তার প্রকাশক লঘু নিবন্ধ। আধুনিক বাঙালি তথা ভারতীয় মেয়েদের মেক-আপ তথা কৃত্রিম প্রসাধন-প্রিয়তার আধিক্যের সমালোচনা আছে নিবন্ধটিতে। কিন্তু নেই কোনো তিক্ততা।

তাঁর মতে রংহীন শ্বেত ত্বকের অধিকারী পাশ্চাত্য মেয়েরা ব্যবহার করে রুজ, লিপস্টিক, নেল পলিশ-এর মতো নানা কৃত্রিম রং। উদ্দেশ্য আপন ত্বকের বর্ণাভাব পূরণ। ভারতীয় তথা বাঙালি মেয়েরা স্বাভাবিক চিক্কন শ্যামল বা বাদামি রঙের দেহত্বকের অধিকারী। তাদের রং মাখা তথা প্রসাধনের প্রয়োজন নেই। তাদের প্রসাধনের কারণ শুধুই ফ্যাশন।

মেক-আপ-এর বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের অভিযোগ দুটি—প্রথমত, নৈপুণ্যের অভাবে মেক-আপ প্রায়শ স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। লেখকের দ্বিতীয় আপত্তিটি নৈতিক। মেক-আপ মেয়েদের সহজাত প্রকৃত রূপ-রং আবৃত করে। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রসাধনকে বলেছেন 'চেহারার উপর জালিয়াতি'।

প্রসাধনের সপক্ষে বলা হয় মেয়েরা চিরকালই আপন রূপকে বাড়াবার চেষ্টা করেছে। সে প্রয়াসের প্রধান কারণ স্বীয় দেশ ও সময়ে প্রচলিত সৌন্দর্য ধারণার সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নেওয়ার বাসনা। এজন্য তারা করেছে অর্থব্যয় এবং নিজেকে দিয়েছে কষ্ট। রোমের রানিরা স্নান করেছেন গাধার দুধে। কালিদাসের কাব্যনায়িকারা বনজ উপকরণ দিয়ে করেছে প্রসাধন। চীনা মা মেয়ের পা ছোটো করার জন্য তাকে কষ্ট দিয়েছেন নির্মমভাবে। জাপানের মেয়েরা খোপা ঠিক রাখার জন্য বালিশের পরিবর্তে শক্ত কাঠে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে বহু যুগ ধরে। কাজেই প্রসাধন মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

আবার একথাও বলা হয় সূক্ষ্ম বিচারে পান খাওয়া থেকে খোপায় ফুল দেওয়া, সাবান মাখা—সবই প্রসাধন। আজকের লেখকের আপত্তি রুজ লিপস্টিক নিয়ে। আমাদের পূর্বপুরুষদের আপত্তি ছিল সাবান ব্যবহারেও।

আসলে স্বাস্থ্য এবং সুরুচির সঙ্গে আত্মবিজ্ঞাপনের প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম। সভ্যতা মানে যে বাহুল্যের সংখ্যা বৃদ্ধি একথা অবশ্য স্বীকার্য। বাহুল্য তাকেই বলা যায়, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার জন্য যা অপরিহার্য নয়। মেক-আপ তাই

বাহুল্য মাত্র। নিত্য ব্যবহারের জিনিসকে সুন্দর করে তোলা সভ্যতার একটি লক্ষণ। নারী ও পুরুষের নিজেকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টাও স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি। মেক-আপ-এর সঙ্গে তার তফাত শুধু মাত্রায়। প্রকৃতির দান ফুল চুলে পরলে মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ জাগে তার সঙ্গে তুলনা চলে না রাসায়নিক প্রসাধনীর চতুর ব্যবহারের।

মেক-আপ-এর একটি সামাজিক দিকও বর্তমান। বোতলে পোরা সৌন্দর্য উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল ব্যাবসা। অর্থের বিনিময়ে সুন্দর করে তোলার দোকানের সংখ্যা গেছে বেড়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্যচর্চার গ্রন্থ। এর ফলে অপচয় ঘটছে বিশাল পরিমাণ অর্থের।

চড়া দামে নানা মাপের শিশি, বোতল কৌটোয় ভরা প্রসাধন কেনা এবং ব্যবহার করার কারণে যে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে তা দিয়ে সমাজপরিবর্তন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রসাধনের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, এসব যুক্তি শোনার মতো মন কারও নেই। কাজেই চলবে সময়, শ্রম আর অর্থের এই বিপুল অপচয়; প্রতিবাদ হবে নিষ্ফল।

১৯৪৩ সালে লেখা **'হরিবোল'** নিবন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বুদ্ধদেব বসুর জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা। বিয়ের পর বুদ্ধদেব বসু ভাড়া নিয়েছিলেন রসা রোডের মোড়ে গোলাম মহম্মদ ম্যানসন-এর দোতলার একটি ফ্ল্যাট। বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসুর ছিল ভয়ানক ভূতের ভয়। তিনি 'জীবনের জলছবি' নামের স্মৃতিচিত্রে লিখেছেন "ওই অঞ্চলের শববাহকরা সব এই বাড়ির তলা দিয়ে গিয়ে ডাইনে কেওড়াতলার দিকে মোড় নিত। প্রত্যেকটি হরিধ্বনির শব্দে রাত্রিবেলা আমার ঘুম ভেঙে যেতো। বাকি রাত ভূতের ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে থাকতাম।" (পৃ. ১০৯, 'জীবনের জলছবি', প্রতিভা বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ ১৪০০, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০৩)।

এই বাস্তব প্রেক্ষিতে রচিত **'হরিবোল'** নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে ভূতের ভয়ের প্রকৃতির চমৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরে খ্রিস্টান ও মুসলিম শবসৎকারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের শবসৎকার পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন তিনি। কিন্তু 'হরিবোল'-এর ঘোর বিরোধিতা করা হয়েছে নিবন্ধটিতে। তবে শববাহকদের হরিধ্বনি দেওয়ার কারণও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

নিবন্ধের প্রথমে আছে মক্ষিরানি নামে অভিহিত পত্নীর 'হরিবোল' শ্রবণজনিত ভয়ের ছবি। সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে ভূতের ভয়ের প্রকৃতি—"যেটা অলৌকিক, যেটা ইন্দ্রিয়ের অতীত, যেটা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, তার প্রতি কোনো কোনো চিত্তের একটা স্বাভাবিক উন্মুখতা থাকে।...বাইরের কোনো কোনো ঘটনাও মনের মধ্যে এই আতঙ্ক-আবিল অস্বাস্থ্য ঘনিয়ে তুলতে সাহায্য করে।...ভিত্তিহীন ভয়ের বীজ আছে আমাদের সকলের মনেই, তবে...আমাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনের রোদালো জোরালো স্রোত তাকে প্রায় সব সময়ই চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের মনকে বাইরে থেকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তোলা সম্ভব যে জীবনের সহজ প্রসন্নতা থেকে স্খলিত হ'য়ে আমরা তখনকার মতো ভয়ের পিচ্ছিল চোরাবালিতে ডুবে যাই।

সেই ভয়ই ভয়ের রাজা যা অহেতুক। যে-ভয়ের কারণ আছে তার সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু যে ভয় নিষ্কারণ সে অপ্রতিরোধ্য। অল্প মাত্রায় হলে সেটা উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, মনুষ্যত্বের পক্ষে তার মতো হানিকর আর-কিছুই নয়।" (পৃ. ১৬৯-১৭০, 'হরিবোল', 'উত্তরতিরিশ', বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ ১৯৪৫, ২য় সংস্করণ ১৯৫২)। এই ভয়ের উদ্রেক করে শববাহকদের উচ্চ 'হরিবোল' ধ্বনি। নিজের স্ত্রীর মধ্যে তিনি দেখেছেন ভয়ের সেই ভয়ানক রূপ—যা তাঁদের বাসা বদলাতে বাধ্য করে। কারণ নেই যে ভয়ের সেই ভূতের ভয়ের এমন নিপুণ অথচ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ কমই দেখা যায়।

প্রবন্ধের পরের অংশে লেখক যুক্তি আর উদাহরণ দিয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলিম শবযাত্রার পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন; তুলনা করেছেন হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সৎকার পদ্ধতির। তাঁর মতে হিন্দুদের দাহ পদ্ধতিই সৎকারের সেরা

উপায়। কবরে স্থানের অপচয় হয়। কফিনবন্ধ প্রিয়জনের শবদেহ মাটির গর্ভে ক্রিমিকীটের খাদ্য হয়—এ ব্যাপারটির মধ্যে আছে বীভৎসতা।

খ্রিস্টানদের গোরস্থানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তীব্র। ধনীরা সেখানে সেরা স্থানটি কবরের জন্য ক্রয় করেন; তাঁদের কবরে বসানো হয় মার্বেল ফলক।

অবশ্য চিতার চাইতে কবরে আপাতশোভনতা বর্তমান। তাই ইংরেজি সাহিত্যে কবর নিয়ে লেখা হয়েছে স্মৃতিমেদুর, বিষণ্ণ, দীর্ঘশ্বাসবহুল অনেক কবিতা। কবর যেন মৃতের প্রিয়হৃদয়ে বেঁচে থাকার করুণ প্রয়াস। তথাপি মৃতের স্মৃতি মনে রাখে না তার প্রিয়তম জন। জীবনের পক্ষে সেটাই শুভ ও স্বাস্থ্যকর। প্রিয়জনের কবরে ফুল দিয়ে দুদিন চোখের জল ফেলা যায়। কিন্তু সময়ের অমোঘ নিয়মে শোক জীর্ণ হয়। ফুল দেওয়া অনুভূতি-শূন্য নিয়মে পরিণত হয়—যা মৃত্যুকে করে অপমান।

তার চেয়ে ভালো শবদেহকে ভস্ম করে তাকে দেহের আদি উৎস মাটি, আগুন, জল, আকাশ, হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়া। যা শেষ হয়েছে তাকে নির্মমভাবে মুছে দেওয়াই শ্রেয়। প্রাণহীন দেহ আবর্জনা মাত্র, তা বিনষ্ট করাই উচিত। মৃত্যুর মধ্যে যে চরম সমাপ্তি আছে—দাহ তারই প্রতীক। হরিধ্বনি ক্ষুণ্ণ করে মৃত্যুর এই মহিমা।

বুদ্ধদেব বসু হরিধ্বনির কারণ সন্ধান করতে চেয়েছেন। কখনও তাঁর মনে হয়েছে এ ধ্বনি দিয়ে জীবিতকে মৃত্যুর অনিবার্য পরিণামের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ যদি সর্বদা মৃত্যুচিন্তায় মগ্ন থাকে তবে জীবন হয় অর্থহীন। অথবা মানুষ ভালো-মন্দ সংক্রান্ত সংস্কার উপড়ে ফেলে মরিয়া হয়ে জীবনকে ভোগ করতে চেষ্টা করে। তাই যুদ্ধসময়ে সৈনিকরা হয়ে ওঠে এত উচ্ছৃঙ্খল।

মৃত্যুভাবনা প্রবল হলে মানুষকে হয় সংসার ত্যাগ করতে হয় নতুবা বেছে নিতে হয় আত্মবিনাশের পথ। নয়তো শিক্ষা-সংযম বিসর্জন দিয়ে প্রবৃত্তিতাড়িত জীবন যাপন করতে হয়। যে চিন্তা মানুষকে অমানুষ করে দেয় তার কোনো মূল্য নেই। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণের বিকাশের জন্য প্রয়োজন মানুষ মৃত্যুহীন—এই ভ্রান্তির। কাজেই জীবিতকে অর্ধমৃত করে তোলার উপায় স্বরূপ এই হরিধ্বনি বন্ধ হওয়াই ভালো।

এর পরে বুদ্ধদেব অনুমান করেছেন নির্জন নিশীথে শব বহন কালে প্রায় অনাত্মীয় শববাহকগণ ভয় পায়। সেই ভয় দূর করার জন্যই তারা অমানুষিক উচ্চ স্বরে হরিধ্বনি দেয়। ব্ল্যাক আউট-এর সময় রাত তিনটেয় পাহারাওলাও এরূপ বীভৎস চিৎকার করে যা নিরীহের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয় আর দুর্বল হৃদয়কে বন্ধ করে দিতেও পারে।

একদা বুদ্ধদেব দেখেছিলেন মুসলমানদের নিঃশব্দ শব বহনের গম্ভীর মহিমাময় একটি দৃশ্য। তাঁর মতে এ দৃশ্য মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের মনে উদ্রেক করে শান্ত শ্রদ্ধার। মৃত্যুর অর্থ গতিময় জীবনের অবসান। দেবতার নামে উন্মত্ত চিৎকার সে অবসানের শান্ত গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করে।

খ্রিস্টানদের শবযাত্রার মধ্যে লেখক দেখেছেন পার্থিব সমারোহের আধিক্য। জমকালো গাড়িতে চলে কারুকার্যমণ্ডিত কফিন। গাড়িতে করে সঙ্গে চলে সুসজ্জিত শোককারীগণ। জাঁকজমক ক্ষুণ্ণ করে মৃত্যুর মহিমা।

হিন্দু মতে আত্মীয়বন্ধুরা নতমুখে নগ্নপদে মৃতের শব বহন করে। এই দৃশ্যের বেদনার্দ্র বিনয় দর্শকমনে উদ্রেক করে সম্ভ্রমের। কিন্তু 'হরিবোল' চিৎকার বিনাশ করে দৃশ্যটির গভীর গম্ভীর আবহ। হিন্দুদের দু-একটি নীরব শবযাত্রাও লেখকের চোখে পড়েছে। সে দৃশ্য দেখে তাঁর মনে জেগেছে জীবন সম্বন্ধে শুদ্ধ পবিত্রতার বোধ। চিৎকার ও নৃত্যসহ কীর্তন মুছে দেয় এই শুদ্ধতা অনুভব। দেবতা যদি থাকেন তবে নীরবে তাঁর নাম করাই উত্তম। অকারণ অন্যকে পীড়িত করে দেবমহিমা কীর্তন অর্থহীন।

বুদ্ধদেব বসুর গভীর চিন্তার ফসল এ প্রবন্ধ কিন্তু বাঙালিমনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। শববাহকদের হরিধ্বনি

আজও রাত্রির আর মৃত্যুর গাম্ভীর্য বিনষ্ট করেই চলেছে। তথাপি তাঁর চিন্তা মুষ্টিমেয় পাঠককে বিষয়টি সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে; এখানেই নিবন্ধটির সার্থকতা।

১৯৪৪ সালে রচিত **'আড্ডা'** নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু আড্ডার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আড্ডার কয়েকটি শর্তও তিনি দিয়েছেন। আড্ডা জিনিসটি তাঁর কাছে এতই বড়ো যে বিশ্বপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে আড্ডার মূল্য নির্ধারণ করেছেন তিনি নির্দ্বিধায়।

বুদ্ধদেবের মতে আড্ডা একান্তভাবে বাঙালির প্রাণের জিনিস। মিটিং, পার্টি, ক্লাব—কোনো কিছুর সঙ্গে আড্ডার তুলনা চলে না। মিটিং-এর থাকে নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য। পার্টিতে আনুষ্ঠানিকতা বড়ো বেশি। ক্লাব-এ প্রাণ নেই, বহিরঙ্গই সেখানে প্রাধান্য পায়।

আড্ডার মেজাজ অন্য কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ; সম্ভবত একারণেই অন্য কোনো ভাষায় নেই আড্ডার প্রতিশব্দ। অন্য অন্য দেশের লোক বক্তৃতা দিতে পারে, রসিকতা করতে পারে, ফুর্তি করে রাত কাটাতে পারে—কিন্তু আড্ডা দিতে পারে না।

যদিও ভারতের সর্বত্র আড্ডা দেখা যায়; কিন্তু বাংলার সজল কোমল আবহেই তার পূর্ণ বিকাশ। বাংলার ঋতু সমূহের কমনীয় পরিমণ্ডলে আড্ডা পায় বিকাশের পরিবেশ। যে সব দেশে শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই প্রবল সেখানে আড্ডা জমে না।

লেখকের মতে আড্ডা মানুষকে শিক্ষিত করে; সাহিত্যিক আড্ডা থেকে পায় সাহিত্যের উপাদান।

আড্ডার মেজাজ খামখেয়ালি, তার আত্মা অত্যন্ত কোমল। তাই আড্ডার পোশাক পার্টি বা মিটিং-এর মতো ধোপদুরস্ত নয়। আড্ডার পোশাক হওয়া চাই স্পর্শকোমল আরামদায়ক, অযত্নহীন এবং ছন্দোময়।

সকলে আড্ডা দিতে পারে না। আড্ডার নামে প্রায়ই সমবেত মানুষগুলি স্ব স্ব অধীত বিদ্যার পরিচয় দিতে চায় অথবা জমিয়ে তোলে পরচর্চার আসর।

দিন নির্দিষ্ট করে আড্ডার আসর জমানো যায় না। লেখক বলেছেন একবার তাঁরা আড্ডা থেকে সাহিত্যসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ করে সেখানে করা হত নানা সদালাপ। কিন্তু দু-তিনটি সফল অধিবেশনের পর সে প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায় নিছক নিয়মপালন।

নিয়ম করে অফিস যাওয়া যায়, আড্ডা দেওয়া যায় না। আড্ডার প্রধান শর্ত নিয়মহীনতা। আড্ডা হবে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত এবং সচেতনতাহীন। তবে এলোমেলোভাবেও গড়ে ওঠে না আড্ডা। প্রচ্ছন্ন ও প্রখর গঠনশক্তিই গড়ে তোলে আড্ডা। কয়েকটি শর্ত পূরণ হলে তবেই পাওয়া যায় প্রকৃত আড্ডা।

(১) আড্ডার মানুষগুলি সম-মর্যাদার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যিনি সত্যই বড়ো তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়; তাঁর সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায় না। মানসিকতার দিক থেকে যারা কিছুটা নিম্নস্তরের তাদের সঙ্গেও আড্ডা জমে না।

আড্ডার লোকসংখ্যা দশ-বারো জনের বেশি ও তিনের কম হওয়া চলে না। দশ-বারো জনের বেশি হলে আড্ডা হয়ে যায় সভা; তিনের কম হলে হয় কথোপকথন।

আড্ডার মানুষগুলির থাকা দরকার মানসিক জ্ঞাতিত্ব। মনের টান যাদের স্বাভাবিকভাবে কাছে টানে আড্ডা তাদের জন্য এবং তাদের মধ্যেই সীমিত থাকা দরকার।

আড্ডা বসবে এই সম-মানসিকতার মানুষগুলির কারও বাড়িতে। যে বাড়ির আবহ আড্ডার সবচেয়ে অনুকূল—সেটিকেই আড্ডার জন্য নির্বাচন করা উচিত। এজন্য বাড়ি ভাড়া করলে আড্ডা হয়ে উঠবে কৃত্রিম। তবে মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তনও প্রয়োজন। কারণ এর ফলে মন হয়ে ওঠে সতেজ।

ঋতুর পরিবর্তন আর চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে আড্ডা ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে ছাদে চলে যেতে পারে। তা হলে প্রকৃতির ছোঁয়া লাগবে মানুষের মনে। তবে স্থান নির্বাচনে ভুল হলে চলবে না। ভুল জায়গা মানুষগুলিকেও ভুল মানুষ করে দিতে পারে।

আড্ডার জায়গায় আড়ম্বর থাকবে না, থাকবে আরাম। আসবাব হবে নরম নিচু; সহজে স্থানান্তরযোগ্য হলে আরও ভালো। চেয়ার-টেবিলের কাছেই থাকবে ফরাস। ইচ্ছা হলেই ক্লান্ত কেউ সেখানে গড়িয়ে নেবে অনুমতি ব্যতিরেকেই।

পানীয় বলতে থাকবে কাচের গ্লাসে ঠাণ্ডা জল আর পাতলা সাদা কাপে সুগন্ধি সোনালি চা। খাবার হবে স্বাদু, স্বল্প এবং শুকনো। ফলে শুয়ে শুয়েও খাওয়া যাবে আর হাত ধোয়ার জন্য স্থান ত্যাগ করতে হবে না। জমকালো নয়, পরিচ্ছন্ন বাসনে গৃহকর্ত্রী নিজেই পরিবেশন করবেন খাদ্য-পানীয়।

কথাবার্তা হবে মসৃণ-মন্থর; তাতে থাকবে না কোনো চিন্তা বা চেষ্টা। মনের যে সব চিন্তা কাজের চাপে চাপা থাকে—কথায় সেসব ভাবনা প্রকাশ লাভ করবে। কথার মধ্যে থাকবে না সংকোচ, বিষয়বুদ্ধি বা দায়িত্বের চিহ্ন। ভালো কথা বলার বাধ্যতা থাকবে না। বলা হবে সাধারণ কথা। নতুবা চুপ করে থাকাই শ্রেয়। জোর করে বানানো কথার চাইতে নীরবতাই ভালো। কথার টানাপোড়েনে বোনা কাপড়ের সোনালি পাড় নীরবতা। পাড় কাপড়কে দেয় রূপ, নীরবতা কথাকে দেয় স্পষ্টতা। তাই চুপ করে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাজয় বা সৌজন্যের ত্রুটি মনে করেন তাঁরা আড্ডার মর্ম বোঝেন না।

তার্কিক আর পেশাদার হাস্যরসিকের জন্য আড্ডা নয়। প্রাজ্ঞ বা লোকহিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষও থাকবে আড্ডার বাইরে। কারণ উদ্দেশ্য আড্ডার শত্রু। মহৎ বা তুচ্ছ—কোনো উদ্দেশ্যই আড্ডায় প্রবেশ করবে না। আড্ডা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়; কোনো কাজ বা উপকারও তা থেকে পাওয়া যায় না। আড্ডা বিশুদ্ধ, নিষ্কাম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

স্ত্রীপুরুষের মিশ্রণেই আড্ডা জমে ওঠে। কেবল পুরুষদের আড্ডায় কথা আবদ্ধ থাকে কাজের সীমায়; কখনও বা তা লঙ্ঘন করে সুরুচির গণ্ডী। শুধু মেয়েদের আড্ডায় আলাপ সীমিত থাকে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার মধ্যে।

মহিলাদের সংস্রবে পুরুষদের আর পুরুষ-সান্নিধ্যে মেয়েদের রসনা হয়ে ওঠে মার্জিত, স্বর নিম্ন, অঙ্গভঙ্গি শ্রীযুক্ত। মেয়েদের স্নেহ, লাবণ্য ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্ম বন্ধন আর পুরুষদের ঘরছাড়া মনের উদ্দাম বলিষ্ঠতা—দুয়ের মিশ্রণে আড্ডা হয়ে ওঠে সুন্দর, সুষম এবং সম্পূর্ণ। কারণ পৃথকভাবে নারী ও পুরুষ অনেক ভালো কাজ করে। কিন্তু উভয়ের মিলনেই সৃষ্টি হয় ছন্দ।

আড্ডা স্থির নয় বহমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় তার রূপ। আড্ডায় পাওয়া যায় মনের খোরাক। আড্ডায় কখনও প্রধান হয় কৌতুকের উদ্দেশ্যহীনতা; কখনও নিছক ভালো লাগার অনুভূতি পূর্ণ করে দেয় আড্ডা; কখনও স্বপ্নমেদুরতা সঞ্চার করে মনে। আড্ডা বুদ্ধিতে দেয় হৃদয়ের স্পর্শ; হৃদয়ে সঞ্চারিত করে বুদ্ধির দীপ্তি।

বিশ্ব সভায় অখ্যাত বাঙালির একমাত্র অথচ অতুল্য সম্পদ আড্ডা।

প্রকৃতি সহ্য করে না কোনো অতিরেক। তাই বিশ্বজয়ী জাতিও প্রকৃতির নিয়মে ভ্রষ্ট হয় খ্যাতির শিখর থেকে; তলিয়ে যায় অখ্যাতির অতলে। বাঙালির লোভ নেই বিশ্ব জয়ে। তার মন্ত্র বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র; উদ্দেশ্যহীন আনন্দের ব্রত তার আড্ডা। আড্ডা জোর করে দখল করে না কিছু। কারণ ধরে রাখতে গেলেই হারাতে হয়; ছেড়ে দিলেই যায় পাওয়া। তাই পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি যখন বলে 'কাড়ো' তখন আড্ডার নীতি 'ছাড়ো'। তাই আড্ডা মৃত্যুহীন।

বুদ্ধদেব বসুর দুশো দুই নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির আড্ডা ছিল বিখ্যাত। তাঁর স্বভাবও ছিল আড্ডার অনুকূল। আপন অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার রসে জারিত এই মনোরম নিবন্ধটির তুলনা বাংলা রম্য নিবন্ধের ইতিহাসে কমই পাওয়া যায়।

১৯৪৫-এ লেখা ব্যতিক্রমী এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত একটি নিবন্ধ **'সবচেয়ে দুঃখের দু-ঘণ্টা'**। চুল কাটার মতো আটপৌরে বিষয়টিকে যেভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে এ নিবন্ধে তা বুদ্ধদেব বসুর অনুভবশক্তির সূক্ষ্মতার প্রমাণ।

চুল কাটবার জন্য সেলুন-এ যাওয়া লেখকের পছন্দ নয়। মানসশক্তির উৎস দেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গটির উপর কোনো অপরিচিত ব্যক্তির ইচ্ছেমতো ব্যবহার তাঁর কাছে অস্বস্তিকর। তার উপরে আছে তার অমনোযোগিতা আর সেলুন-এর অপরিচ্ছন্নতা। অথচ স্বজন-বন্ধুদের তীক্ষ্ণ বচন বর্ধনশীল কেশগুচ্ছের অধিকারী তাঁকে নানাভাবে বিদ্ধ করে। ফলে দু মাস অন্তর লেখককে অসহায়ভাবে মাথা সঁপে দিতে হয় হৃদয়-সম্পর্কহীন কেশকর্তকের কাছে।

তাঁর মনে পড়ে অতীতের তরুণ কেশকর্তক কাঁচি-সম্বল গোবিন্দকে। সে সবার চুল কাটত না। স্ব-নির্বাচিত বিশেষ বিদগ্ধ জনেরই সে চুল কাটত। তার নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব। চুল কাটার সঙ্গে চলত তার মুখ। এইভাবে সে অপনোদন করত একটানা বসে থাকার ক্লান্তি। আসলে কিছুটা মনের সম্পর্ক ছিল বলেই গোবিন্দ ছিল বুদ্ধদেবের পছন্দের পরামাণিক। সে মারা গেছে। বর্তমানে আর নাপিতেরা চুল কাটতে আসে না বাড়ি বাড়ি। এখন যেতে হয় সেলুন-এ। সেখানে নরসুন্দরগণ নিজেদের মধ্যে সিনেমার গল্প নিয়েই ব্যস্ত থাকে। চুল যিনি কাটাচ্ছেন তাঁর মনোরঞ্জনের কথা মনেও পড়ে না তাদের। তাই চুল কাটতে গিয়ে বেশির ভাগ পুরুষ দেহের ক্লান্তি আর মনের শূন্যতার চাপে ঘুমিয়ে পড়েন। অনেকে সময়টা কাটান নির্বিঘ্ন নিরাপদ ঈষদুষ্ণ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে। বুদ্ধদেব বসু এ সময় কাটান হালকা প্রবন্ধ, সংকলন, সজীব সাময়িক পত্র বা হৃদয়প্রধান গল্প-সংকলন পড়ে। এসব বই হওয়া চাই বড়ো হরফে ছাপা; তাদের পাতা থেকে চুলের কণাগুলি সহজেই ফুঁ দিয়ে সরানো যাওয়া চাই। এরকম সরস সহজ বই হাতে এলে তিনি তুলে রাখেন।

এর পরে আছে সময় নির্বাচনের ব্যাপার। সেলুন বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস আর শুক্রবার আধা বন্ধ। শনি-রবিও ছুটির দিন আর সকাল-সন্ধ্যায় সেলুনে হয় ভিড়। সোম, মঙ্গল, আর বুধবারের দুপুর তাঁর প্রিয় সময়। যে দিন এ সময়ে কোনো জরুরি কাজ থাকে না সেদিনই তিনি ট্রামে চড়ে যান হাজরা মোড়। যাওয়া, ফিরে আসা আর একটু অপেক্ষা করা—সব মিলিয়ে দুটি ঘণ্টা লাগে। সময় কাটাবার জন্য তিনি পড়েন বই—সেসব বইয়ের ধরন আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর মতে পুরুষের চুল কাটা, দাড়ি কামানো—এসব সামাজিক কর্তব্য মাত্র। তার সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ নেই। কিন্তু মেয়েদের প্রসাধনের সঙ্গে আছে তাদের প্রাণের যোগ। সমাজের গণ্ডী সেখানে নেই। আনন্দ উচ্ছল প্রাণের লীলায় তাদের প্রসাধন হয় সুন্দর। একলা মেয়ের কেশচর্চা—শুকোনো থেকে বাঁধা পর্যন্ত পূর্ণতার প্রশান্তিতে অপরূপ। আর একদল মেয়ের চুল বাঁধার সময় হাসিতে, কটাক্ষে, অঙ্গভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আনন্দ। এই আনন্দের যোগ নেই বলেই পুরুষের চুল কাটার দোকানগুলি এত গম্ভীর নীরস। রূপ সম্বন্ধে মেয়েরা বিনীত ও তৃপ্ত। পুরুষের মধ্যে আছে রূপের গোপন অহংকার। তাই সে আয়না দেখতে চায় না।

এই সব কারণে সেলুন-এ প্রাণের সচলতা অনুপস্থিত। নেই জিনিস ক্রয়ের সময়ের মতো কৌতূহল ও ঔৎসুক্য। পরস্পরের অপরিচিত কিছু ব্যক্তি একই ঘরে এমন বিষয়ে লিপ্ত যাতে তার মনের কোনো ভূমিকা নেই—আছে কেবল শারীরিক উপস্থিতি। তাই চুলকাটা লেখকের কাছে অস্বস্তিকর। দেহধারণের এই অনিবার্য দুঃখের জন্যেই তিনি পরজন্মে মেয়ে হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তারপরই তাঁর মনে পড়েছে আজকাল মেয়েরাও চুল কেটে ফেলছে। তাই তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত সবচেয়ে দুঃখের দুটি ঘন্টা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক মাত্র পথ—না জন্মানো।

চিন্তার নিজস্বতায়, প্রকাশরীতির স্বচ্ছন্দ সরসতায়, উপলব্ধির প্রাণময় ভাষ্য রচনায় এই নিবন্ধটি হয়ে উঠেছে সফল একটি রম্য রচনা।

১৯৪৬-এ ১৬ আগস্ট স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবিতে মুসলিম লিগ-এর প্ররোচনায় কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শুরু হয়েছিল ভয়ংকর এক দাঙ্গা। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন—বিবিধ নারকীয়তার কলঙ্কিত এই দাঙ্গা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার অন্যত্র। এ বছরের অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে শুরু হয় এই দাঙ্গা। এখানে আক্রান্ত হয় হিন্দু নারীপুরুষ। গান্ধিজি দাঙ্গা থামানোর তাত্ত্বিক আলোচনা ছেড়ে স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা করেন। তদনুসারে তিনি কয়েকজন অনুগত সংগঠনকর্মী সহ বাংলায় আসেন ১৯৪৬-এর অক্টোবর-এ আর নোয়াখালি যান নভেম্বর-এ। মার্চ পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন স্থান ঘুরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন।

এই প্রেক্ষিতেই রচিত হয় বুদ্ধদেব বসুর '**নোয়াখালি**' নিবন্ধটি। রচনাকাল ১৯৪৭। নিবন্ধটি দুটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে আছে নোয়াখালি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। বুদ্ধদেব বসুর জীবনের প্রথম তেরো বছর কেটেছিল নোয়াখালিতে। তখন তিনি স্কুলে পড়তেন না। নোয়াখালির মাঠঘাট আর প্রান্তরে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর কৈশোর দৃষ্টিতে নোয়াখালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল অপরূপ। নারকেল-ঝাউ-সুপুরি-গাব-মাদার প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ সমাবেশে ঘন সবুজ হয়ে থাকত নোয়াখালি। গৃহস্থদের পরিষ্কার উঠোনে ফুটত নানা রঙের গাঁদা। অসংখ্য পুকুর আর ডোবা স্নিগ্ধ করেছিল নোয়াখালির আবহ। অঞ্চলটির পাশ দিয়ে বয়ে যেত ভীষণ এবং শ্রীহীন নদী মেঘনা। বছরের অর্ধেক সময় নদীটি হয়ে যেত প্রায় জলহীন। কিন্তু বর্ষা তাকে দিত প্রবল শক্তি। তার স্রোতের আঘাতে ভেঙে পড়ত পাড়। শহরের প্রায় অর্ধেক চলে গিয়েছিল তার গ্রাসে।

এরপর বুদ্ধদেব নোয়াখালি শহরের মানুষগুলির পরিচয় দিয়েছেন। শহরটিতে ছিল প্রায় বাঙালি হয়ে যাওয়া কিছু পোর্তুগিজ, স্থায়ী বাসিন্দা কয়েক ঘর বাঙালি গৃহস্থ আর কয়েকজন সরকারি চাকুরে। যেমন এস. ডি. ও., পুলিশ-ইন্সপেক্টর, পি. ডবলিউ. ডি.-র কর্তা প্রভৃতি। এঁদের প্রায় সকলেরই বদলির চাকরি। স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ঈষৎ আত্মম্ভরী ছিলেন গুহ, গুহরায় আর রায়চৌধুরী পরিবার। এঁরা ছিলেন আধুনিকমনা। এঁদের ছেলেরা পড়ত কলকাতার কলেজে। ছুটিতে এসে শহর জুড়ে করত হইচই। টাউন হল-এ করত নাটক। ডাকযোগে আনাত নানা পত্র-পত্রিকা। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এদেরই কেউ কেউ গিয়েছিল জেলে।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন শহরের বিখ্যাত কবিরাজ অশ্বিনীবাবুর কথা, তাঁর অঙ্কশিক্ষক যামিনী মাস্টার আর মুসলমান বন্ধুদের কথাও তিনি লিখেছেন।

এরপরে তিনি নোয়াখালির ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এ ভাষা বাংলা হলেও আপন বিশেষত্বে স্বতন্ত্র। ক্রিয়াপদে পৃথক প্রত্যয় যোগ ও উচ্চারণে অর্ধস্ফুট 'হ'-এর আধিক্য এ ভাষার বিশেষত্ব।

বুদ্ধদেব বসুর মনে প্রিয় শহর নোয়াখালির নগণ্যতা সম্পর্কে ছিল আক্ষেপ। তাই তিনি বলেছেন বাংলা চিরকালই উত্তর ভারতের কাছে অবজ্ঞেয় দেশ। সেই বাংলার মধ্যে পূর্ব বাংলা তথা বাঙাল দেশ আরও অবজ্ঞার পাত্র। পূর্ব বাংলার মধ্যে নোয়াখালির স্থান আরও নীচে। সংবাদপত্রে তার নাম মুদ্রিত হয় না। অথচ এখানে আধুনিক মানসিকতার মার্জিত, শিক্ষিত ভদ্রজনের অভাব নেই। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল নোয়াখালি। তবু তাকে গণনীয় মনে করেনি মানুষ। এই অখ্যাতি সহ্য হচ্ছিল না বুদ্ধদেব বসুর, তাই ১৯২২-এ নোয়াখালি ছেড়ে ঢাকায় পড়তে গিয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি।

১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার নগ্ন হিংস্রতায় অবসান ঘটল এই অবজ্ঞার। শুধু বাংলা বা ভারত নয়; সারা

পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল নোয়াখালির নাম। লন্ডন, নিউইয়র্ক-এর সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল তার কথা। নারীত্ব এখানে লাঞ্ছিত হয়েছে তাই মেয়েদের মনে রক্তের অক্ষরে আঁকা হয়ে গেল নোয়াখালি। এমনই করে যেন নোয়াখালি নিল তাকে অবজ্ঞা করার প্রতিশোধ।

এরপরে নোয়াখালিতে এলেন গান্ধি। নোয়াখালি তার সব পাপ, সব হিংসা ধুয়ে ফেলে পবিত্র হল স্নিগ্ধ হল। নোয়াখালির রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর—এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্থান ধন্য হল গান্ধিজির আগমনে। এভাবেই নোয়াখালিতে—যেখানে মানবতা হয়েছিল ধ্বস্ত, সেখানেই ঘোষিত হল মনুষ্যত্বের জয়। সমকালের এক অখ্যাত স্থানে রচিত হল মনুষ্যত্ব কি বিনষ্ট হবে—চিরকালের এই প্রশ্নের চিরন্তন উত্তর। মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি তার লোভ, হিংসা—এ সবের ইতিহাস, যুদ্ধ-পরের সারা বিশ্বে লেখা হচ্ছে। আর মানুষের মধ্যের দেব অংশ, পবিত্র অংশের প্রকাশ দেখা গেল একমাত্র নোয়াখালিতে। কারণ গান্ধিজি নোয়াখালির হিংসাধ্বস্ত মানুষগুলির মনে জাগিয়েছিলেন মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। এভাবেই গড়ে উঠল মানুষের দেবত্বের ইতিহাস।

নোয়াখালির দাঙ্গার জন্যই গান্ধিজি মুক্তি পেলেন স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির কূটচক্র থেকে, মানুষের দুর্দশা যাদের ব্যাবসার মূলধন তাদের হীন ষড়যন্ত্র থেকে; সভা, সমিতি, দল, দলপতি, তর্কবিতর্ক মন্ত্রণার বিষতিক্ত পরিবেশ থেকে। সংখ্যা, তথ্য ও আইনের স্থূলতা থেকে; লোভীর সঙ্গে নিহিত প্রতিযোগিতার ঘূর্ণি থেকে, মিথ্যা, মত্ততা, জননেতার অবশ্যম্ভাবী আত্মার বিনষ্টি থেকে নোয়াখালির দাঙ্গার জন্য মুক্ত হতে পারলেন তিনি।

জনতার নীতিহীন উন্মত্ততা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের প্রাথমিক শর্ত। জননেতাকে মেনে নিতে হয় নীতিভ্রষ্টতা। তাই নেতা হওয়ার অর্থ চরিত্রচ্যুত হওয়া। সংঘবদ্ধভাবে মানুষ ভালো হতে পারে না। কেবল এককভাবে মানুষ হতে পারে সৎ আর মহৎ।

মানুষ তা বুঝতে পারে না। এমনকি পঁচিশ বছরের মধ্যে দুই বিশ্বযুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের বীভৎস রূপ দেখে আর যুদ্ধ-পরবর্তী স্থানীয় ছোটো ছোটো যুদ্ধ দেখেও মানুষের এ বিশ্বাস নষ্ট হয়নি যে রাজনৈতিক নেতারাই মানুষের উদ্ধারকর্তা। বাস্তব সত্য এই যে রাজনীতি মানুষকে দেয় পারস্পরিক হানাহানির অস্ত্র। তাকেই উজ্জীবনের উৎস বলে মানুষ ভুল করেছে। তার এই ভ্রান্তি আজও ঘোচেনি।

গান্ধিজি মুক্ত হয়েছেন এই ভ্রম থেকে। সারা জীবন স্বদেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। আজ সে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় হিংসার এমন উদ্বেলিত রূপ দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। নিজেকে তিনি সরিয়ে নিলেন রাজনীতির কুটিলতা থেকে।

তিনি আশ্রম ভেঙে দিলেন, ত্যাগ করলেন সঙ্গীদের। সঙ্গীহীন হয়ে তিনি স্বীয় বিবেকের অনুসরণ করতে পারলেন। এভাবেই তিনি অর্জন করলেন পবিত্রতা। এই একক সাধনা তাঁর কর্মের প্রায়শ্চিত্ত। এ ছাড়া তাঁর জীবন-সাধনা ব্যর্থতা হত। তিনি মানুষকে নিয়ে যেতে চান সেই স্বর্গে যেখানে নেই কোনো হিংসা বা ঈর্ষা। সেখানে ভয় নেই বলে বীরত্ব অর্থহীন, লোভ না থাকায় ত্যাগ অনুপস্থিত; ক্রোধ না থাকায় নেই সংযম।

ব্যর্থতা নিশ্চিত জেনেও লুপ্ত হল না তাঁর আশা। তিনি নোয়াখালির দুর্গম পথে হেঁটে গেলেন। গ্রামের পর গ্রামে, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাড়িতে তিনি গেলেন; অংশ নিলেন প্রত্যেকের দুঃখের। আটাত্তর বছর বয়সেও দৃঢ় দেহ আর আশ্চর্য শান্ত স্বভাব নিয়ে তিনি নোয়াখালির পথে বের হলেন। অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা বা চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কাম্য নয় রাজনৈতিক স্বর্গ—যা বহু মানুষের অতৃপ্ত কামনা আর ঈর্ষাকে তৃপ্ত করতে জন্ম দেয় যুদ্ধের। তিনি গড়ে তুলতে চান সেই স্বর্গ—কোনো কোনো মানুষ যার আভাসটুকু পায়। সে স্বর্গের পূর্ণ রূপ দান এবং তাকে রক্ষা করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম।

দাঙ্গা-বিদীর্ণ, অবজ্ঞাত নোয়াখালির জল-জঙ্গালে, পথের ধুলোয় গান্ধিজি গড়ে তুলেছেন সেই মানসিক শুদ্ধতার আর শান্তির স্বর্গ। তাঁর সেই সাধনাকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে নোয়াখালি শুধু নয় পৃথিবী ধন্য হবে নোয়াখালির সামান্যতা ঘুচবে; সে হয়ে উঠবে অসামান্য।

৩.৩ উত্তরতিরিশ : মূল প্রবন্ধ

আমি এখন আছি তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি জায়গায়। সেখান থেকে তিরিশ যত দূর, চল্লিশও প্রায় তা-ই। অবস্থাটাকে বলা যেতে পারে প্রৌঢ়ত্বের শৈশব। আমার জীবনে যৌবন যখন সদ্যোজাত, সেই রঙিন বছরগুলিতে তিরিশের ধূসর দিগন্ত একটা অস্পষ্ট বিভীষিকার মতো বোধ হতো। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের উদাহরণে উৎসাহিত হয়ে মনে-মনে এও প্রার্থনা করেছি যে ঐ শোচনীয় পরিণাম আসন্ন হবার পূর্বেই আমার জীবনের যেন অবসান হয়। খেয়ালি নিয়তি আমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেনি। ভাগ্যিশ করেনি!

আমাদের যে বয়স বাড়ছে তার অনুভূতি নিজের মধ্যে অনেক সময়ই স্পষ্ট হয় না। এই দেহটাকে অনেকদিন ধরে ভোগ করবার মাশুলস্বরূপ মৃত্যুর নানা অগ্রদূত যতদিন না জানানি দিতে শুরু করে, ততদিন বয়োবৃদ্ধির অনস্বীকার্য ঘটনাকে প্রায় ভুলেই থাকি। বিশেষ করে জীবনের মধ্যবয়সে চারদিকে কর্মের তরঙ্গ যখন উদ্বেল, তখন সে-দিকে মন দেবারই সময় থাকে না। পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণের একটি অনভিপ্রেত কিন্তু নিশ্চিত ফল এই যে, আমার জন্মের তারিখটি প্রতি বছরেই ঘুরে-ঘুরে একবার এসে হাজির হবে; কিন্তু তার সমন্ধে বালকের আগ্রহ কিংবা চিরযৌবনলুব্ধা বিগতযৌবনার উৎকণ্ঠা কোনোটাই অনুভব করি না। সে জড়িয়ে ধরবার মতো ক্ষণিকের প্রণয়ী অতিথিও নয়, এড়িয়ে যাবার মতো ভয়ংকরও নয় সে; সে যেন কোনো বাল্যবন্ধু, পঁচিশ বছর আগে যার সঙ্গে খুবই ভাব ছিলো, কিন্তু অধুনা যার সঙ্গে যোগসূত্র গেছে ছিন্ন হয়ে, এখন কদাচ রাস্তায় দেখা হলে একটু মাথা নেড়ে আপন কাজের তাড়নায় নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হই। ওর বাৎসরিক আবির্ভব যে যৌবনের চোর এবং জরা-মৃত্যুর দেহ-দেশ-ব্যাপ্ত পঞ্চমবাহিনী, সে-কথা তথ্য হিশেবে নির্ভুল বলে জানি, কিন্তু সত্য বলে অনুভব করি না।

তাই বলে এমনও নয় যে বয়স বাড়বার খবরটা আমরা একেবারেই ভুলে থাকতে পারি। মনে করিয়ে দেবার জন্য আছে বাইরের জগৎ। যেমন রেলগাড়ির ভিতরে বসে তার গতিটা উপলব্ধি করতে হলে তাকাতে হয় বাইরের বিপরীত ধাবমান গাছপালার দিকে, তেমনি বহির্জগতের পরিবর্তনের ছবি দেখেই আমরা অনুভব করতে পারি যে আমাদের বয়স বাড়ছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের যে-আন্তরিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, প্রকৃতির যে-কোনো প্রক্রিয়ার মতোই তা এমন একটি নিখুঁত ছন্দে বাঁধা যে তা সহজে লক্ষ্যগোচর হয় না; আমাদের ছেলেপুলেরা যে বাড়ছে তা যেমন আমরা বুঝেও বুঝি না, তেমনি আমরা নিজেরা যে বদলাচ্ছি তাও নিজের কাছে স্পষ্ট হতে-হতে অনেকগুলো বছর কেটে যায়। মনে-মনে কেমন একটা ধারণা থাকে, এখনো সেই কলেজের ছাত্রই আছি বুঝি— এই তো সেদিন কম্পিত বক্ষে ম্যাট্রিকুলেশনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলুম। স্মৃতির ভেল্কিতে মাঝখানকার অনেকগুলো বছর ঝাপসা হয়ে আসে, জীবনের অতীতাংশ যতই বহরে বাড়তে থাকে, ততই দূর অতীতের কাছে চলে আসবার ঝোঁক দেখা যায়। বার্ধক্যে বাল্যস্মৃতিই হয় প্রিয়তম আলোচ্য। পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে জীবন যখন অনায়াসে চলতে থাকে, এমন সময় একদিন দেখি সদ্য এম.এ.-পাশ করা ছেলেরা আমার কাছে এসে খুব সমীহ করে কথা বলছে। সাহিত্যে যারা নবাগত তাদের নতচক্ষু বিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। আরো বেশি মুগ্ধ হই, যখন দেখি আমার বিরুদ্ধে তরুণতরদের রসনা ও লেখনীর দুর্দম উদ্যম। তখনই বুঝতে পারি, আমার বয়স হয়েছে। যাদের সমবয়সী বলে গ্রহণ করেছি তাদের সঙ্গে আমার এক যুগের তফাৎ। সাহিত্যক্ষেত্রে এক যুগের তফাৎ প্রায়ই দুর্লঙ্ঘ্য, দু-তিন যুগ কেটে

গেলে আবার প্রশস্ত হয় মিলনের ক্ষেত্র। যে-আমি একদিন ছিলাম তরুণ লেখকদের মধ্যে তরুণতম, সেই আমাকে এখন থেকে তরুণদের হাতে ক্রমাগত মার খেতে হবে এ-কথা ভেবে কালরহস্যের বিচিত্রতায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। নবযুবকের দল যদি আমরা বিরুদ্ধতা না করতো, সেটা হতো প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। পূর্ববর্তীকে এই আক্রমণ ওদের যৌবনের স্বাক্ষর, আর আমার আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞান।

এদিকে হয়তো একদিন দেখা হয় কোনো-একটি তরুণীর সঙ্গে—দস্তুরমতো ভদ্রমহিলা, বিবাহিতা, মাতা, সংসারের বিচিত্র বন্ধনে স্নিগ্ধ গম্ভীর। অবাক হয়ে খবর শুনি যে ইনি সেই বালিকা, যাকে মাতা-ঈভের সজ্জায় ধেই-ধেই করে লাফাতে দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখি কলেজের সহপাঠিনীকে, সংস্কৃতের অধ্যাপক যাকে ভুল করে ডাকতেন বনশ্রী বলে, তার মুখে জরার সুস্পষ্ট মানচিত্র। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধুকন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র আসে। সব মিলিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আমি বয়স্ক; আমাকে বয়স্ক বানিয়ে ছাড়ে। নিজের ভিতরের পরিবর্তন সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু বহির্জগতের এই পরিবর্তনস্রোত বার-বার আমার মনের তটরেখায় ধাক্কা দিয়ে বলে যায় বয়স বাড়ছে, বুড়ো হতে চলেছো। তার পৌনঃপুনিক পরামর্শ শেষ পর্যন্ত আর অবজ্ঞা করতে পারি না, বয়স্কোচিত স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের ভাব ধরি; আমি-যে আর যুবক নই সে-কথা অনায়াসে মেনে নিই, এবং তার জন্য মনে কোনো দুঃখও হয় না।

অন্তত, আমার তো হয়নি। বরং যৌবনের ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে মধ্যবয়সের গভীর গম্ভীর একাগ্রতায় যে পৌঁছতে পেরেছি, এতে আমি আনন্দিত।

আমার মনে হয় যৌবনকে নিয়ে কবিরা চিরকালই কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। এত স্তব, এত স্তুতি, এত ছন্দ—সে কার উদ্দেশে? কত মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্য-নিবেদন শতাব্দীর স্রোত পার হয়ে এসে পড়েছে কায়িক যৌবনের একটি মনোহারিণী প্রতিমার পায়ে, যার রূপের অনেকখানি কবিকল্পনা থেকেই আহরিত। আর যেহেতু কবিরা বেশির ভাগই পুরুষ, সেই প্রতিমা নারীদেহেরই অবয়ব দিয়ে গড়া। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, নারীদেহে যৌবনসমাগমের যে-ব্যঞ্জনাটি প্রাকৃতিক কারণেই সুনির্দিষ্ট, তারই বন্দনায় বিশ্বের কবিকুল মুখর। কবিদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা নয় এটা, কিন্তু কথাটা কি সত্য নয়?

তবে কবিদের পক্ষেও বলবার কথা আছে। যৌবনের যে-সংকীর্ণ সংজ্ঞা আমি দিয়েছি তা হয়তো তাঁরা সম্পূর্ণ মেনে নিতে রাজি হবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন: বিশ্বপ্রকৃতির আদিম প্রাণশক্তি যেখানেই অখণ্ডরূপে প্রকাশিত, সেখানেই আমাদের অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে; সূর্যোদয় আমাদের মুগ্ধ করে, সমুদ্র আমাদের রক্তে ঢেউ তোলে, বসন্তে সবুজ গাছটির দিকে তাকিয়ে চোখে আমাদের পলক পড়ে না। মানুষের দেহে যৌবনবিকাশও সেই আদিম প্রাণশক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস, তাই সে এত সুন্দর; সে-উচ্ছ্বাসের আধার যখন হয় নারী তখন আমাদের সর্বদেহমনের ব্যাকুলতা দিয়ে যে তার ভজনা করি তার কারণ প্রাকৃতিক হলেও নিতান্তই জৈব নয়। ওর সমস্তটাই সৃষ্টির আদিলীলার অন্তর্গত; যে-বিশ্বশক্তির টানের নদীতে জোয়ার আসে, বসন্তে ফুল ফোটে, এখানে আমরা তারই অধীন। কবিরা বলবেন, এ জিনিষটা ছোটো করে দেখো না। বস্তুর দিকে না-তাকিয়ে ভাবের দিকে চেয়ে দ্যাখো। কোনো বিশেষ-একটি মেয়ের দেহে যৌবনের আবির্ভাব একটা জীবতত্ত্বঘটিত তথ্য মাত্র, তা নিয়ে বিস্মিত কি উল্লসিত হবার কিছু নেই; কিন্তু বাসনার যে-বিপুল আলোড়ন সে নিজের অজানিতেই তার চারদিকে বিস্তার করে, যে-মোহ সে ছড়ায়, যে-স্বপ্নে সে জড়ায়, তারই বন্দনা যুগে-যুগে যদি আমরা না করি, তবে আমরা কবি কিসের। যৌবনের ক্ষয় আছে, কিন্তু সেই মোহ তো চিরন্তন, সেই মোহই তো আমাদের অনন্তযৌবনা উর্বশী।

কবিদের এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যে নিছক শারীরিক যৌবনের বন্দনার পরিমাণও

বড়ো কম নয়। বিশেষত, কবিরা নিজেরা যখন যখন সদ্যযৌবনাপন্ন, সেই সময়টার যৌবনের তথ্যকেই সত্যরূপে চিত্রিত করার ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। স্বয়ং শেক্সপিয়র কাঁচা বয়সে 'ভিনাস অ্যান্ড অ্যাডনিস' লিখেছিলেন। যৌবনই প্রাণীজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সময়, এই ধারণাটি নানা ভাষায় কাব্যে বার-বার ফিরে-ফিরে এসেছে। 'The days of our youth are the days of our glory';—যখন জীবনতরণী অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে মৃদু তালে ভেসে চলে—'Youth at the prow and Pleasure at the helm',—তার সঙ্গে কি অন্য-কোনো অবস্থার তুলনা হয়! যৌবন যে ক্ষণিক, সে-বিষয়েও কবিদের বোধ তীব্র; তাই এই অচিরস্থায়ী স্বর্ণযুগটুকু হেলায় না-হারিয়ে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করো, এই পরামর্শ অনেকবারই তাঁরা দিয়েছেন। 'Gather ye rose-buds while ye may.' প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসে হারানো যৌবনের জন্য বিলাপ করেছেন অনেক কবি— 'When we *were* young! Ah, woeful when!' রবীন্দ্রনাথও করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম হাস্যের চকিত আভা ধরা পড়ে; যৌবন চলে যাচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু আমি জানি ও যাবার নয়— তাঁর ভাবখানা যেন এই রকম। তাঁর যৌবন-বিদায় যে তাঁরই বর্ণিত প্রেমিকের বিদায়ের মতো—

ভাবছ তুমি মনে-মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার—

ওতে অনেকখানি ছল আছে। এ যেন সদর দরজায় বন্ধুকে বিদায় দিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা— তাই করুণ কাতর বিদায়বাণী বলতে গিয়েও মুখের হাসি চাপা থাকছে না। এইজন্য 'ক্ষণিকা'তে হাসি-কান্নার এই বিচিত্র বিজড়িত লীলা, এইজন্য পঞ্চাশোর্ধ্বে 'বলাকা'র অপরূপ যৌবনবন্ধনা। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই যৌবনের তথ্যকে বড়ো করে দেখেননি, তার সত্যকেই দেখেছিলেন— সে-কথা স্পষ্ট বলা আছে 'চিত্রাঙ্গদা'য়; তাঁর সাধনা যৌবনের আয়ুর উদ্দেশে নয়, তার আত্মার উদ্দেশে, এবং সে-সাধনায়, আমরা সকলেই জানি, কী অসামান্য তাঁর সিদ্ধি। যৌবনের যে-পরশমণির স্পর্শ আছে 'বলাকা'য়, কোনো তরুণ রূপ-পূজকের সাধ্য নেই তা দিতে পারে। সত্তরের মোহনায় এসে তিনি প্রশ্ন করলেন:

যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি?

জবাব দিলেন নিজেই:

নহে, নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে ....

আশি বছরের রোগ-জর্জর দেহে যখন তিনি বন্দী, তখনও তাঁর মধ্যে দেখেছি যৌবনের এই উপলব্ধি। মানবজীবনে চিরযৌবনের যদি কোনো মানে থাকে সে তো এ-ই, এ ছাড়া আর কী? রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে যৌবনের কবি—হেরিক নন, বায়রন নন, ভারতচন্দ্র নন।

তবে যৌবনের যেটা নিতান্ত দৈহিক দিক, তার নুন আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে খেয়ে থাকি, অতএব তার গুণ গাইবার লোক কোনোকালেই বিরল হয় না! তার আবির্ভাব দেহে-মনে এমন একটি জন্মান্তরকারী বিপ্লব আনে, যার সংঘাতে কবিতা ফুটবেই। আমি শুধু বলতে চাই যে ঐ অবস্থাটাকে কবিতায় যতটা সুখের বলে বর্ণনা করা হয় আসলে তা তত সুখের হয় না— অনেকের পক্ষেই হয় না। নবযৌবনের অকারণ পুলকের সঙ্গে

অনেকখানি অনর্থক দুঃখও জড়িত, যাদের স্বভাব কল্পনাপ্রবণ তাদের পক্ষে সে-দুঃখ প্রায় দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে। একদিকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, অন্য দিকে চারদিকের পাথরের দেয়ালে নির্ঝরের কপাল ঠুকে মরা। একদিকে আশ্চর্য জাগরণ, বিশ্বজগতের সঙ্গে সচেতন মনে প্রথম রোমাঞ্চকর পরিচয়, অন্য দিকে নিরন্তর আত্মনিপীড়ন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগতিস্থাপনের অক্ষমতাজনিত অফুরন্ত যন্ত্রণাভোগ। এক হিশেবে ষোলো বছরের ছেলের মতো দুঃখী আর নেই; তার নবজাগ্রত, বিনিদ্র আত্মচেতনা তাকে এক মুহূর্তের শান্তি দেয় না; তার চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা সবই কেমন খাপছাড়া; সামাজিক পরিবেশে সে অত্যন্ত অসংগত, এবং সে নিজেও তা জানে। তাতে তার দুঃখ বাড়ে বই কমে না। মনে মনে তার ধারণা যে পৃথিবীটাকে বদলে দেবার জন্যই সে এসেছে, কিন্তু তার ইচ্ছেমতো পৃথিবীর এক চুল বদল হচ্ছে না, সব দিকেই বয়স্কদের পাষাণ-রাজত্ব অটুট থেকে যাচ্ছে, এমনকি বাস্তব জীবনে সে নিজেও তার আদর্শকে সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না, প্রায়ই ঘটছে স্খলন-পতন, এবং এ-নিয়ে তার মনে একটি তীব্র বিক্ষোভের তোলপাড় অবিশ্রান্ত চলেছে। শুধু তা-ই নয়, তার এই দুঃখে সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, কারণ দুঃখটা যে তার ঠিক কী নিয়ে, তা ধারণা করবার মতো পরিণত চিন্তাশক্তি তার নেই, তার উপর মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করবার কৌশলও সে শেখেনি। তাই ঠিক তার মনের কথাটি কাউকেই সে বলতে পারে না— খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না— বোবা দুঃখের বোঝা অসহায়ভাবে বয়ে বেড়াতে হয়। যে-সব উপলক্ষে তার দুঃখের অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে সেগুলি প্রায়ই তুচ্ছ— পরবর্তী জীবনে সে-সব স্মরণ করে হয়তো তার হাসি পায়—কিংবা পায় না। যাঁরা একেবারেই পাকা হিশেবিয়ানার উচ্চচূড়ায় অধিরূঢ় না হন তাঁদের পক্ষে হাসি না-পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ উপলক্ষটা যা-ই হোক, দুঃখটা তো বাস্তব, সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। শিশু তার পুতুলের পা ভাঙলে কাঁদে, আমাদের চোখে কারণটা অতি তুচ্ছ, কিন্তু তাই বলে তার দুঃখটা তো কম নয়। সে-দুঃখের স্থায়িত্ব হয়তো অল্প, কিন্তু তীব্রতা খুবই বেশি। শেলির বিষয়ে লিখতে গিয়ে ফ্রান্সিস টমসন ঠিকই বলেছিলেন যে শিশুর দুঃখ যেমন ছোটো, শিশুও তো ছোটো। ছোটো মানুষের পক্ষে ছোটো দুঃখের নিপীড়নই দুঃসহ। কথাটা এত সত্য যে বলবার যোগ্যই হতো না, যদি-না দেখা যেতো যে ব্যবহারি জীবনে আমরা প্রায়ই এটা ভুলে থাকি।

নবযৌবনের এই যে ছবি আমি আঁকলুম তা সকল বয়স্কজনের স্মৃতির সঙ্গে মিলবে কিনা জানি না। আমি অবশ্য আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। হয়তো আমি অত্যন্ত বেশি ভাবপ্রবণ ছিলুম বলে অত্যন্ত বেশি কষ্ট পেয়েছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার বয়স যখন আঠারোর অঞ্চলে, আমি মনে-মনে এ প্রার্থনা জানিয়েছি— ঈশ্বর, আমাকে খুব চটপট বুড়ো করে দাও, তাহলে বাঁচি। এ-প্রার্থনায় আন্তরিকতার অভাব ছিলো না, কেননা চারদিকে তাকিয়ে দেখেছি বয়স্কদের প্রশান্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা; তারা খায়-দায়, আপিশ করে, ঘুমোয়, কিছু নিয়ে ছটফট করে না— এদিকে আমি কত-কিছু নিয়েই দিন-রাত জ্বলে-পুড়ে মরছি। সে-বয়সেও এটা বুঝেছিলাম যে আমার অতি-তারুণ্যই আমার এই যন্ত্রণাভোগের হেতু, বুড়োদের যত্ না মুখে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি, মনে-মনে তাদের হিংসে না-করেও পারিনি। আমার সেই কাঁচা বয়সের মন ছিলো এত বেশি অনুভূতিশীল যে সেটা প্রায় একটা ব্যাধির মতো, যে-কোনো দিক থেকে একটুখানি হাওয়া দিলেই আমি উদ্দাম হয়ে উঠতুম, নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে এক-এক সময় মনে হতো ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ক্ষতবিক্ষত জাহাজের মতো।

বেঁচেছি। যৌবনের উত্তাল জলরাশি পার হয়ে এসেছি, প্রৌঢ়ত্বের শান্ত দিগন্ত দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে। যদি দেবতা এসে বর দিতে চান— তোমাকে আবার আঠারো বছরের যুবা করে দিচ্ছি, আমি হাত জোড় করে বলবো, দোহাই তোমার প্রভু, বর ফিরিয়ে নাও। আঠারো হবার দুঃখ একবার যে পেয়েছে, সে কি আবার সেখানে ফিরে যেতে চাইবে! অনেকে বলেন, আহা, শিশুরা কী সুখী! যদি আবার শিশু হতে পারতুম! কথাটা মোটেও চিন্তা করে বলেন না। শিশুর মন সচেতন নয়; তার কল্পনা আছে, চিন্তা নেই; তাই তার সুখ-দুঃখ কুয়াশার মতো ব্যাপ্ত কিন্তু

অনবয়ব; আর বয়স্কদের শাসনের শিশুর জীবন এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে বিজড়িত যে আমার তো মনে হয়, তার জীবনে দুঃখের ভাগই বেশি। বেচারারা কি ইচ্ছেমতো দেয়ালে ছবি আঁকতে পারে, না কি সোফার কাপড় কাটতে কিংবা নিজেদের হাত-পা ভাঙতেও পারে! এমনকি তারা রেলগাড়ির জানালার ধারে বসলেও আমরা হৈ হৈ করে উঠি। নিজস্ব দেহে কিংবা পৈতৃক সম্পত্তির যেটুকু ভাঙচুর তারা করে উঠতে পারে, সে নেহাৎই বয়স্কদের কঠিন প্রহরী-দৃষ্টি এড়িয়ে, এবং বিধাতার অবিমিশ্র আশীর্বাদে। কোনোরকমে যে একবার সাবালক হয়ে উঠতে পেরেছে, সে যে কী করে আবার শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছ প্রকাশ করতে পারে, আমার তা কল্পনার অতীত। ঠিক তেমনি অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন বয়স্ক লোক তারুণ্যের উন্নত্ততায় আরো একবার ঝাঁপ দিতে চায়।

তারুণ্যের উন্মাদনা শেষ হয়েছে, বেঁচেছি। জীবনের মধ্যবয়সের স্থৈর্য এসেছে, বেঁচেছি। যে-কোনো ক্ষণিক আকস্মিক হাওয়ায় আর আন্দোলিত হতে হয় না। একটি মুহূর্তের একটি অনুভূতি আর মনকে কান ধরে নাচিয়ে বেড়াতে পারে না। যখন-তখন যে-কোনো কারণে-অকারণে চিত্তবিক্ষেপ আর ঘটে না, হাতের কাজে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হতে পারি, এদিকে অবকাশসম্ভোগের আনন্দকেও খামোকা মন-খারাপের হাওয়া এসে মলিন করতে পারে না। রাগ চাপতে শিখেছি, শিখেছি উদ্যত অভিমানকে এক চড়ে দাবিয়ে দিতে, ফুটো কলসি থেকে জলের মতো ভালোবাসা আর যেখানে-সেখানে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে না। তুচ্ছকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করার শক্তি পেয়েছি। জীবনে দুঃখের ভাগ আশ্চর্যরকম কমে গিয়েছে। সেই সঙ্গে সুখও কি কমেছে? না তো।

আমার বিশ্বাস জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন নয়, জীবনের মাঝামাঝি অবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো। আমি নিজে আপাতত ঐ অবস্থায় এসে পড়েছি বলেই যে তার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করছি, তা নয়; শুনতে পাই বর্তমানকে অবজ্ঞা করে অতীতের অতিরঞ্জিত স্তাবকতা করাই মনুষ্যস্বভাব। তার উপর জীবন যখন মধ্যদিনে, তখন ভোরবেলার সোনালি আলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলাই সাহিত্যের ঐতিহ্যসংগত। কিন্তু সত্যি বলছি, এই সময়টাতেই জীবন সবচেয়ে উপভোগ্য, অন্তত আমার তো তা-ই বোধ হচ্ছে। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ শক্তির আমি এখন অধিকারী, জরার আভাসমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে না; অথচ সে-শক্তি যেখানে-সেখানে ডন কুইক্সোটীয় চালে অন্ধ বেগে ধাবিত হচ্ছে না, তাকে সংহত রেখে তার যথাসম্ভব সুমিত প্রয়োগের বিদ্যা আমার শেখা হয়েছে। কাঁচা বয়সে জীবন ছিলো গুরুজনের শৃঙ্খল জড়িত; এখন আমি স্বাধীন, নিজের জীবিকা একান্তরূপে নিজেই উপার্জন করি, আমার উপর কথা বলবার কেউ নেই। এই স্বাধীনতা যে কত আনন্দের তা কেমন করে বোঝাই। স্বোপার্জিত অন্নের প্রথম স্বাদ আমার মনে এনেছিলো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, সে-রোমাঞ্চ এতদিনের অভ্যাসের চাপেও একেবারে নষ্ট হয়নি। জীবিকা-অর্জনের যে-পরিশ্রম ও বিরক্তি সেটা কখনোই যে নিপীড়ক বলে বোধ হয় না তা বলবো না, কিন্তু মোটের উপর ওটাকে আমি কিছু মনেই করিনে, তার বিনিময়ে যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তাতে ক্ষতিপূরণ হয়েও অনেকখানি হাতে থাকে। তার উপর, আমি বিশেষভাবে ভাগ্যবান, কারণ আমার জীবিকার কিছু অংশ আমার আনন্দের সঙ্গে মিলিত; আমাকে যে সব সময়ই নিরানন্দ অপ্রিয় কাজ করতে হয় না এ-জন্য নামহীন অদৃষ্টের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বতই উচ্ছ্বসিত। এই সাহিত্যরচনা আমার জীবিকাও বটে, আনন্দও বটে; আমার কাজের আর খেলার স্রোত এখানে এক হয়ে গেছে, এবং আধুনিক জগতে কাজে যার আনন্দ সে-ই তো ভাগ্যবান।

তরুণ বয়সে মনে-মনে ভয় ছিলো যে প্রৌঢ়ত্বের প্রভাবে আমারও হৃদয়বৃত্তি হয়তো নিঃসাড় হতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এখন দেখছি যে তা তো হলো না। অনেকেরই হয়—আবার কারো-কারো হয়ও না; কেন হয় না, সে-আলোচনায় গিয়ে কাজ নেই। বিশ্বজগতের সঙ্গে এখন আমার কী সম্বন্ধ, সেটা স্পষ্ট করে বোঝবার যখন চেষ্টা করি, তখন দেখতে পাই যে নবযৌবনের শক্তি তার অমিত অনুভূতিশীলতায়, তার দুর্বলতা তার ভারসাম্যের, তার মাত্রাজ্ঞানের অভাবে। আর পরিণত বয়সের শক্তি তার সংযমে, তার বুদ্ধির বলশালিতায়, তার দুর্বলতা তার হৃদয়বৃত্তির

ক্ষীণতায়, তার উৎসাহের রক্তহীনতায়। 'If youth could and age would!' এই তো চিরকালের আক্ষেপ। কিন্তু একটা অবস্থা নিশ্চয়ই আছে যখন উভয়শক্তির মিলন হয়, নয়তো পৃথিবীতে এত বড়ো-বড়ো কাজ সম্পন্ন হতে পারতো না। সেটাই মধ্যবয়স।

দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী সম্বন্ধে আমার কৌতূহল, আমার আনন্দবোধে এখনো মরচে পড়ার লক্ষণ নেই। অশিথিল উৎসাহ নানা কর্মস্রোতে প্রবাহিত। কাঁচা বয়সের অনুভূতির প্রবলতা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তার প্রয়োগবিদ্যা তখনও অনায়ত্ত, তাই ও-বয়সে ভালো কবিতা লেখা সম্ভব হলেও অন্য কোনোদিকেই কাজের মতো কাজ প্রায় কিছুই হয়ে ওঠে না। নবযৌবনের বিপুল ব্যর্থতা প্রকৃতিরই নির্দেশ, অনেকখানি অপব্যয় না-করে প্রকৃতি কিছুই গড়তে পারে না; মানুষের দেহ যেমন বহু শতাব্দীব্যাপী অমিতব্যয়ী বিবর্তনের ফল, তেমনি শৈশব-যৌবনের বিস্তর বাজে খরচের ফলেই মানুষের পরিণত মন গড়ে ওঠে। এখন আমার অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে পর্যবেক্ষণ; উৎসাহের উচ্ছলতা বুদ্ধির দৃঢ়তাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে; প্রতিদিনের হাতে এই শিক্ষাই আমি পাচ্ছি কেমন করে মনের সচেতনতাকে, হৃদয়ের সংবেদনাকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়— আর এখানেই নবযুবকের উপর আমার জিৎ। বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন এইমাত্র প্রথম দেখলুম, নবযৌবনে এই আনন্দ অস্পষ্ট ভাব-নীহারিকার আকারে মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে রাখে; সে-আনন্দ অনেকটা নিপীড়নেরই মতো, তার বিদ্যুৎ-ময় স্পর্শ প্রায় শ্বাসরোধকারী। এখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার দেখাশোনা প্রতিদিনের নতুন আলোয়, প্রতি মুহূর্তের নতুন কোণ থেকে, সেটা কেবলই একটা ভাব আর নয়, সেটা রূপ; তাকে শুধুই অনুভব করি না, তাকে চোখেও দেখি। এই দেখার পটভূমিকায় আছে অতীত জীবনের সঞ্চিত অচেতন অভিজ্ঞতা; তারই আলোয় বস্তু স্পষ্ট আকার নেয়, যা ছিলো হাওয়া তা হয়ে ওঠে ছবি। অল্প বয়সের বাষ্পাকুল মন কিছুই দ্যাখে না, শুধু অনুভব করে— তাই তার আনন্দের মধ্যে দুঃখের পরিমাপ এত বৃহৎ।

সেই ভাববিহবল তারুণ্যের লীলা আজ আমার আশেপাশে চোখ মেলে দেখছি, আর মনে-মনে হাসছি। সে-হাসি ঈর্ষার নয়, করুণার নয়, ব্যঙ্গের নয়, সে-হাসি ভালোবাসারই। ওর মধ্যে আমারই অতীতের ছবি দেখতে পাচ্ছি, ওখানে চলেছে আমরাই পুনর্জন্ম, এদিকে আমি নির্লিপ্ত হয়ে কোণের আসনটিতে বসে দেখছি। এর চেয়ে উপভোগ্য অবস্থা আর কী হতে পারে? কোনো সন্দেহ নেই, এই সময়টাই জীবনের শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থায় আরো কুড়ি বছর হয়তো কাটাতে পারবো, এমন আশা করা অন্যায় নয়। আরো কুড়ি বছর! আরো কত ঐশ্বর্য, আরো কত পরিণতি, আরো কত সার্থকতা! আনন্দে-উৎসাহে আমার বুক ভরে উঠছে। জীবনের জয় হোক! কত নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে কাঁপছে, পূর্ণতার সম্ভাবনায় অচেতন মনের বিশাল অরণ্যে কত আলোড়ন।— কিন্তু অচেতনকে এখনই আহ্বান করবো না; যা প্রচ্ছন্ন তা প্রচ্ছন্নই থাক, যথাসময়ে তা প্রকাশিত হবে। আপাতত আমি আমার এই সদ্য-আগত মধ্যজীবনকে আমার নবীন প্রৌঢ়ত্বকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাই, সাদরে সানন্দে তাকে বরণ করি; সে আমাকে ধন্য করেছে, পূর্ণ করেছে, আশা করি আমিও তাকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবো। আপাতত আমার নতুন-পাওয়া শিশু-বয়স্কতার গৌরবে শীতের এই সকালবেলার রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আমি বসলুম— জীবনের স্রোত চোখের উপর দিয়ে ভেসে যাক, আমি চুপ করে দেখি।

৩.৪ 'উত্তরতিরিশ'-এর নির্মাণশিল্প

রম্য রচনা প্রবন্ধেরই শাখা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বর্তমান গঠনগত প্রভেদ। প্রবন্ধ তন্ময় রচনা। রম্য রচনায় প্রাধান্য পায় মন্ময়তা। প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়কে লেখক তথ্য, যুক্তি সহযোগে বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন; রম্য

রচনায় কোনো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয় লেখকের মনের নিভৃত চিন্তাসমূহ। বিবিধ উদাহরণ দ্বারা মনোগ্রাহী ভাষায় লেখক তাদের লিপিরূপ দান করেন।

প্রবন্ধের গঠন সংহত। রচয়িতার ব্যক্তিমনের প্রকাশ সেখানে অনুপস্থিত। রম্য রচনা অনেকটা শিথিল গঠন; লেখকের মানসিক অনুভব এখানে অনায়াসে স্থান করে নেয়। কিন্তু মননগভীরতা ভিন্ন অনুভবের স্বচ্ছন্দ রূপদান সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তীক্ষ্ণ মনন ও গভীর অনুভব-ক্ষমতার অধিকারী। 'উত্তরতিরিশ'-এর কুড়িটি নিবন্ধে রম্য রচনার এই সব শর্ত সে কারণেই রক্ষিত হয়েছে। লেখক বুদ্ধদেব বসুর অনুভূতির জগতে যে সব বিষয় এবং ঘটনা আলোড়ন তুলেছে তাদের স্বচ্ছন্দ, হৃদয়বেদ্য ভাষারূপ লক্ষিত হয় এই কুড়িটি রচনায়। এই সব নিবন্ধের মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত নিবন্ধ যেমন আছে তেমনই আছে বিশেষ ঘটনাকেন্দ্রিক অনুভব-নিবিড় লিখন। সব প্রবন্ধেই নিবিড় চিন্তন ও প্রগাঢ় অনুভব-শক্তির যথার্থ সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

দুটি নিবন্ধের আলোচনা দ্বারা আমরা বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপাত-তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে গভীর অনুভবের চিত্রণ হিসেবে উল্লেখ্য নাম-নিবন্ধ 'উত্তরতিরিশ'। এ নিবন্ধে তিরিশোত্তীর্ণ লেখক প্রৌঢ়ত্বের মহিমা উদাহরণ এবং বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ চেষ্টা বিফল হয়নি। লেখক পুরো বিষয়টি আপন অনুভবের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেছেন। বিষয়টি কিন্তু অভিনব। প্রৌঢ়ত্বের ইতিবাচক দিকগুলি যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এ নিবন্ধে তা পূর্বে বা পরে হয়েছে বলে মনে হয় না।

লেখক বুদ্ধদেব বসুর মতে যৌবনে আবেগ আর উচ্ছ্বাসের অতিরেক লক্ষিত হয়। তুচ্ছ ঘটনা মনকে করে বিচলিত আর বেদনার্ত। পরিণামে গঠনমূলক সৃষ্টি হয় দুরূহ। প্রথম যৌবনে মানুষ স্বভাবত থাকে অভিভাবকের অধীন। ফলে তার আচরণ-বিচরণ হয় শৃঙ্খলিত।

প্রৌঢ়ত্বে আবেগের তরলতা অপগত হয়। তার সঙ্গে থাকে মানসিক স্থৈর্য। ফলে দুঃখ-যন্ত্রণাকে নিয়োজিত করা যায় সৃষ্টিমূলক কর্মে। বার্ধক্যের সামগ্রিক অবসন্নতা প্রৌঢ়ত্বে থাকে না অথচ থাকে স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনের সুখ। এই সব কারণে বুদ্ধদেব প্রৌঢ়ত্বকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলে মনে করেছেন।

তাঁর এ সিদ্ধান্ত তিনি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত করেছেন। প্রৌঢ়ত্বে স্বীয় অনুভবের বর্ণনা, বয়োবৃদ্ধি সম্পর্কে পরিস্থিতি মানুষকে কেমন করে সচেতন করে দেয় তার উদাহরণসহ বিশ্লেষণ যথেষ্ট মনোগ্রাহী। পাশাপাশি যৌবন সম্পর্কে বিভিন্ন কবি এবং রবীন্দ্রনাথের যৌবনভাবনার বিশ্লেষণ প্রবন্ধটিকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বীয় তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল মনের অনুভব-অভিজ্ঞতা দিয়ে বুদ্ধদেব যৌবনের দুঃখময় দিকটির বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রৌঢ়ত্ব সম্বন্ধে আপন যুবক বয়সের চিন্তা আর বাস্তব অনুভবের বিশ্লেষণের পর নিবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছে প্রৌঢ়ত্ব বন্দনায়।

নিবন্ধটিতে নেই দৃঢ় সংহতি। যুক্তি-তথ্যের তুলনায় অনুভবের ঈষৎ এলায়িত উপস্থাপন লেখাটিকে করে তুলেছে মনোরম। এ নিবন্ধটিকে বলা যায় স্বগত চিন্তার ভাষারূপ। লেখকমানসের অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসই রচনাটিকে করে তুলেছে আকর্ষক।

সম্ভবত এ ধরনের অনুভব-গাঢ় নিবন্ধ রচনা কবির পক্ষেই সম্ভব। ব্যক্তি-অনুভবের এমনই রম্য চিত্রণের আর একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' সংকলনের নিবন্ধসমূহ। বুদ্ধদেবের প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে তাঁকে প্রভাবিত করেছেন—এ সম্ভাবনা একেবারে নস্যাৎ করা যায় না।

একান্ত ব্যক্তি অনুভবের মনোজ্ঞ রূপায়ণ 'সবচেয়ে দুঃখের দু-ঘণ্টা' নিবন্ধটি। সেলুন-এ গিয়ে চুল কাটার মতো

তুচ্ছ বিষয় এখানে আকর্ষক হয়ে উঠেছে উপস্থাপন-কৌশলে এবং লেখকমনের স্পর্শে। প্রসঙ্গত মেয়েদের চুল বাঁধার একক ও দলবদ্ধ রূপ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাষায় রূপ পেয়েছে নিবন্ধটিতে।

ঈষৎ শিথিলভাবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপের সুর আর নিভৃত চিন্তার অনবদ্য সমন্বয় লক্ষিত হয় 'উত্তরতিরিশ' সংকলনের প্রতিটি নিবন্ধে। এখানেই রম্য নিবন্ধ-রচয়িতা বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব। তাঁর রম্য নিবন্ধের উৎস অনুভব-বিন্দু। সেই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তাদ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। তুচ্ছ বিষয় তাঁর অনুভব-গভীরতার স্পর্শে হয়ে উঠেছে মূল্যবান। আবার অপেক্ষাকৃত গভীর-গম্ভীর বিষয়ও তাঁর পরিবেশন-গুণে হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ এবং সুন্দর।

ভাষা : 'আমার যৌবন' নামের স্মৃতিকথায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন (পৃ. ৬৪) তাঁর ভাষা চিন্তার দ্বারা নির্মিত—"কলকাতায় এসে নানা জেলার বুলি শুনছি আমি, কুড়িয়ে পাচ্ছি অনেক নতুন মৌখিক শব্দ—আর এমনি করে, কানে শুনে-শুনে, নানান জাতের বাংলা বই পড়ে পড়ে, অনেক বর্জন ও স্বীকরণের মধ্য দিয়ে আমি গড়ে তুলছি সেই ভাষা—অন্তত তার কাঠামো—আজ দীর্ঘ কাল ধরে আমি যাতে কথা বলছি বই লিখছি।" এইভাবে বুদ্ধদেব গড়ে তুলেছেন একান্ত নিজস্ব একটি ভাষা। এ ভাষা বিষয় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না। রম্য নিবন্ধ আর বিষয়-গম্ভীর প্রবন্ধ—দুই ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করেছেন একই ভাষা।

সূক্ষ্ম জটিল চিন্তা আর অনুভবের স্পন্দন প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন বুদ্ধদেব বসু। তাই বুদ্ধিদীপ্তির সঙ্গে কাব্যময়তার মিশ্রণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর রম্য নিবন্ধের ভাষা।

তাঁর গদ্য ভাষার ভঙ্গি ও অন্বয়ে ইংরেজির প্রভাব আছে। তার সঙ্গে তৎসম-প্রবণতা আর বাংলা ভাষার চলিত বাগ্‌ধারা, যেমন 'পাত্তা পাওয়া', 'খেই হারানো' প্রভৃতির মিশ্রণের কারণে জটিল বাক্য (বহু বাক্যের সমাহার ও বিন্যাস) ব্যবহারের পক্ষপাতী হলেও তাঁর ভাষা হতে পেরেছে মনোরম ও আকর্ষক। অন্তরঙ্গ আলাপের ধরনে গঠিত তাঁর গদ্যরীতি সহজেই পাঠকের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারে। পরিমিতিবোধ ও শব্দসচেতনতা বুদ্ধদেব বসুর ভাষার বিশেষত্ব। ভাব প্রকাশের কারণে তিনি তৎসম, তদ্ভব ও ইংরেজি শব্দের মিলিত ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

বিশেষ্য-বিশেষণের সঙ্গে ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় ব্যবহার ('ব্যক্তিতা', 'নিষ্প্রদীপকতা') দুটি শব্দের যোগে নতুন শব্দ নির্মাণ ('সিনেমাচঞ্চল', 'কটকট-শব্দিত'), নতুনভাবে পরিচিত শব্দ-ব্যবহার, ('নিঃশাসন উল্লাস', 'একরোখা আত্মচেতনা'), বিদেশি শব্দের আক্ষরিক ভাবানুবাদ ('রাজন্যজয়িত' (রয়াল)), 'ঝোপ-কামিজ' (বুশ-শার্ট), বিশেষণের নতুন প্রয়োগ ('ন্যাকামি নিপুণ', 'অসেতুসম্ভব') বুদ্ধদেব বসুর ভাষার বিশেষত্ব। 'উত্তরতিরিশ'-এর নিবন্ধগুলিতেও লক্ষিত হয় তাঁর এই সব ভাষা-বিশেষত্ব। সব মিলিয়ে এ গ্রন্থে অনুভবের প্রাণময় রূপায়ণে সফল তাঁর ভাষা। 'উত্তরতিরিশ' সংকলনের 'ব্ল্যাক-আউট' নিবন্ধের কিছু অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হল।

"এই নিষ্প্রদীপকতার আদেশে যেন অন্ধকারের পুনরুজ্জীবনের উৎসব শুরু হলো। আজকাল সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে স্নিগ্ধ চিক্কণ অবলুপ্তি নামে, নিজের বাড়ি হাৎড়ে খুঁজে ফিরি, ... বাড়িগুলি বেশিরভাগ গা-ঢাকা দিয়ে চুপ।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের ব্ল্যাক-আউট-এর এমন অনুভব-উদ্ভূত সপ্রাণ বর্ণনা খুব কম লেখকের লেখাতেই পাওয়া যায়। বস্তুত এই প্রাণময় প্রাঞ্জলতাই 'উত্তরতিরিশ'-এর নিবন্ধ-ভাষার বিশেষত্ব। বিষয় ও মাধ্যমের এই সুষম অন্বয়ে সমৃদ্ধ এ গ্রন্থের নিবন্ধ-ভাষা। উদ্ধৃত অংশটি তারই প্রমাণ।

৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কোন ধরনের প্রবন্ধকে রম্য রচনা নাম দেওয়া হয়েছে? 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থের নিবন্ধগুলিকে কি সার্থক রম্য রচনা বলা যাবে? যুক্তিসহ উত্তর লিখুন।

২। 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থের দুটি নিবন্ধ অবলনে রম্য নিবন্ধের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থের নিবন্ধ সমূহ ব্যক্তিমনের স্পন্দনের লিপিরূপ—উক্তিটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।

৩.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে—সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায়

২। বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গে—সম্পাদক আনন্দ রায়

৩। বুদ্ধদেব বসু—সুদক্ষিণা ঘোষ

৪। আমার ছেলেবেলা—বুদ্ধদেব বসু

৫। আমার যৌবন—বুদ্ধদেব বসু

৬। আমাদের কবিতাভবন—বুদ্ধদেব বসু

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE